সুব্রত কুমার-কে

এই লেখকের অন্যান্য বই

স্ট্রাইকার
স্টপার
কোনি
ননীদা নট আউট
ক্রিকেটের আইন কানুন

॥ এক ॥

"হ্যাল্‌···লো অ্যাণ্ডি রবার্টস, হোয়াটস দ্য ম্যাটার উইথ য়ু! দাঁড়িয়ে কেন? যাও যাও বল করো।"

বলতে-বলতেই প্রৌঢ় কোচ নেটের দিকে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "পীচের কাছে পা, বলের পীচের কাছে পা এনে ফরোয়ার্ড। মুখ উঠছে কেন? নির্ভয়ে খেলো। ইয়েস অ্যাণ্ডি—"

নিচু হয়ে গড়িয়ে আসা বলটা তুলে নিয়ে কোচ ছেলেটির দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

"মাত্র দু ওভার করেই কোমরে হাত! ব্র্যাডম্যান টানা কুড়ি ওভার বল করিয়েছিল মিলারকে দিয়ে ফরটি এইট নটিংহাম টেস্টে। সেকেণ্ড ইনিংসে টোটাল চুয়াল্লিশ ওভার বল করেছিল মিলার। আর তুমি···কী করে খেলবে এই স্ট্যামিনা নিয়ে? প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস, যে ভুলগুলো দেখিয়ে দিলাম শুধরে নাও। যাও যাও— !"

কোচ এগিয়ে এলেন নেটের ধার ঘেঁষে ব্যাটসম্যানের দিকে।

কলকাতার পুব-শহরতলির নেতাজী পার্কে প্রায় পঁচিশটি ছেলেকে নিয়ে সাতদিন হল চলছে এই ক্রিকেট কোচিং। ব্যবস্থা করেছে পার্কেরই নেতাজী ব্যায়ামাগার সি এ বি-র সহযোগিতায়। ছেলেদের বয়স চোদ্দ থেকে কুড়ির মধ্যে। অধিকাংশই স্কুল-ছাত্র। কোচ করছেন যিনি, একদা রঞ্জি ট্রফিতে ছটি ম্যাচ খেলেছেন। প্রচুর বই পড়ে তিনি খেলা শিখেছেন কিন্তু একবার ৩৯ ছাড়া কখনো দশের

বেশি রান করেননি।

"আন্দ, দাঁড়িয়ে থাকিসনি, কোচ তোর দিকে তাকাচ্ছে।"

পাশ দিয়ে যাবার সময় ফিসফিসিয়ে বলে গেল আর একটি ছেলে।

আনন্দ মুখ তুলতেই কোচের সঙ্গে চোখাচোখি হল। বল হাতে সে মন্থরগতিতে বোলিং মার্কের দিকে এগোল। সতেরো কদম দূরত্ব থেকে ছুটে এসে বল করে সে। দূরত্বটা এখন তার কাছে সতেরো মাইল মনে হচ্ছে। কাউকে সে বলতে পারছে না আজ সকাল থেকে গা গরম, হাতে পায়ে গাঁটে গাঁটে ব্যথা, একটু ছুটলেই হাঁফ ধরছে। বল করার পরই বুকে ব্যথা উঠছে। এসব কথা কাউকে বলাটা তার কাছে লজ্জার ব্যাপার। কিন্তু সে বুঝতে পারছে আর এখন বল করতে পারবে না। করলে বুকের যন্ত্রণাটা বাড়বে।

ডেলিভারিটা সে একটু আস্তেই করল। ইনসুইং গ্রিপে বলটা ধরেছিল। অফ স্টাম্পের ইঞ্চি চারেক বাইরে জমিতে পড়ে ছিটকে এসে অফ স্টাম্পে লাগল। পা দুটো নড়াতে পারেনি শুধু কুঁজো হয়ে ব্যাটটা এগিয়ে ধরে ব্যাটসম্যান বোকার মত হেসে কোচের দিকে তাকাল। কোচ হাসিমুখে মাথা নাড়ছে। আনন্দ ভাবেনি বলটা অতখানি ছিটকে ঢুকে যাবে। কি করে এটা হল? ভাবতে ভাবতে ঘাড় ফিরিয়ে শুয়ে-পড়া অফ স্টাম্পের দিকে তাকিয়েই, বুকে হাত রাখল। আবার সেই শ্বাসকষ্ট।

সময় নেবার জন্য আনন্দ আরো মন্থর পায়ে বোলিং মার্কে ফিরে এল। তিনজন স্পিনার ও একজন পেসার বল করছে। তাদের বল হয়ে যাবার পরেও আনন্দ ইতস্তত করল। ইশারায় সে বল করে যেতে বলল তাদের। কোচ সেটা লক্ষ্য করে, এগিয়ে এল।

"ব্যাপার কী?"

"কীরকম যেন হাঁপ ধরছে।"

"এই ক'টা বল করেই! দেখে তো তোমাকে দুর্বল মনে হয় না। ...আইডিয়াল ফিগার ফর এ ফাস্ট বোলার, হাঁপ ধরলে তো চলবে না; রান-আপটা এখনো জার্কি রয়েছে, স্মুদ করতে হবে। তা ছাড়া ডেলিভারির সময় বাঁ-কাঁধটা ব্যাটস্‌ম্যানের দিকে যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, বাঁ-পায়ের উপর ভর দিয়ে পাছা থেকে শরীরের উপর দিকটা হাত থেকে বল ছাড়ার আগের মুহূর্তে যেভাবে ঘুরবে...হচ্ছে না তো। নিখুঁত হতে হলে অনবরত বল করে-করে তৈরী হয়ে উঠতে হবে। আস্তে বল করো, এখনই গ্রেগ চ্যাপেলকে বল করতে হচ্ছে না তো...আস্তে দৌড়ে এসো, আস্তে ডেলিভারি দাও। বয়স কতো?"

"ষোল।"

"ক্লাস?"

"টেন্।"

"ফেল করেছিলে কখনো?"

"না।"

কোচ নেটের দিকে তাকিয়ে ঘড়ি দেখলেন। প্যাড পরে অপেক্ষ-মাণ শিবনাথকে আঙুল তুলে বললেন: "ইউ সোবার্স, গো।" তারপর চেঁচিয়ে—"গাভাসকার লীভ দ্য নেট, ইওর টাইম ইজ আপ্।"

গোবিন্দপ্রসাদ বেরিয়ে এল নেট থেকে।

আরো দুটো বল করল আনন্দ। প্রতিটি ডেলিভারির পর শ্বাস নিতে গিয়ে তার মনে হচ্ছে বুকের মধ্যে বাতাস ঢুকছে না। বুকটা খালি। হাঁটু, কনুই যন্ত্রণায় খুলে পড়বে যেন। কাল রাতে জ্বর

হয়েছিল। আজও হয়তো হবে। সে ভাবল, আর বল করা উচিত নয়। চুপচাপ এক ফাঁকে কেটে পড়তে হবে নয়তো জোর করে বল করাবে। ব্যায়ামাগারের দেয়ালটা পাশেই, সেটা শেষ হয়েছে পলাশ গাছটার লাগোয়া। ওই পর্যন্ত গিয়ে ডানদিকে ঘুরলেই কেউ দেখতে পাবে না। পার্কের পীচের রাস্তাটা ধরে টেনিস ক্লাবে ঢুকে বসে থাকলে কেউ এখন আর খুঁজে পাবে না তাকে। টেনিস তার ভাল লাগে। একসময় তার ইচ্ছা করত কৃষ্ণন হবে কিংবা রোজওয়াল। কিন্তু ক্রিকেটের টান সে আরো বেশি অনুভব করে টেনিসের থেকে।

কোচ বলল, "ফলো-থ্রু না-করেই অমন দাঁড়িয়ে যাচ্ছ কেন?"

আনন্দ বলতে পারল না—কষ্ট হচ্ছে, সেটা আপনাকে আমি দেখাতে চাই না।

ধুতি-পাঞ্জাবি পরা গেমস টিচার বিনয়বাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন কোচের পাশে। তাঁর দিকে তাকিয়ে কোচ বললেন, "পুরো ঝাঁকটার মধ্যে এই একটিই ছেলে···হবে, এরই হবে। ক্লাস আছে, রীতিমত পেস আছে। ক্লুইকলি ত্রুটিগুলো শুধরেও নিচ্ছে।"

বিনয়বাবু খুবই বিজ্ঞোচিত ভঙ্গিতে বললেন, "ইণ্ডিয়ার তো এখন পেস বোলার দরকার।"

কোচ অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন। যেন, বেঁচে থাকার জন্য বাতাসের দরকার এই রকম একটা আবিষ্কারের কথা তাঁকে শোনান হল। "এখন দরকার, মানে! বরাবরই দরকার। নিসার-অমর সিং জুড়ির পর খাঁটি ওপেনিং অ্যাটাক কোনদিনই আমাদের ছিল না, খাঁটি ফাস্ট বোলার নিসারের পর আজও হয়নি। বোধহয় এবার হবে।"

"আনন্দ ?"

কোচ অস্ফুটে কী বলে মাথা হেলালেন।

"দেখছেন, বল করেই বুক চেপে ধরছে।"

"বোধহয় মাস্‌লে টান ধরেছে।...ওয়েল অ্যাণ্ডি, স্টপ নাউ।"

কোচ হাত তুলে আনন্দকে নিষেধ করলেন। "রেস্ট নাও, মাসাজ করো আস্তে আস্তে।"

আনন্দ হাঁফ ছেড়ে কৃতজ্ঞ এবং বাধ্য ভঙ্গিতে বোলারদের দল থেকে সরে দাঁড়াল।

"পড়াশুনোয় মোটামুটি তবে ইম্যাজিনেটিভ রচনা লিখতে পারে। ওর দাদাও যেন কোন এক ক্লাবে খেলে, শুনেছি।"

"কী নাম ?"

"নাম-টাম তেমন নেই।"

"অ।"

বিনয়বাবু 'অ'টিকে গ্রাহ্য না করে বলে চললেন, "গুড বনেদী ফ্যামিলি, সবাই শিক্ষিত। দুই দাদা, বড়টি কানাডায় আছে আট বছর, ডাক্তার। অন্যটি মার্কেন্টাইল ফার্মে জুনিয়ার অফিসার আর ক্রিকেটও খেলে। বাবা উকিল, ভাল প্র্যাকটিস। তিনজনের ছোট্ট ফ্যামিলি।"

"তিনজন কেন, মা ?"

"নেই। ওর ছোটবেলাতেই মারা গেছেন।"

"পুওর বয়।"

কোচ মুখ ফিরিয়ে আনন্দকে দেখতে চাইলেন। আনন্দ নেই। প্রায় একশো বিঘের বিরাট নেতাজী পার্কের উপর দিয়ে চোখ বোলালেন। এক প্রান্তে টেনিস ক্লাব। লোহার উঁচু জালে এবং

পর্দায় ঘেরা দুটি হার্ড কোর্ট ও একটি গ্রাস কোর্ট, সঙ্গে তাঁবু। তার পাশে একটি পুকুর। চিলড্রেন'স পার্ক। অন্যদিকে ফুটবল-মাঠ। ক্রিকেট ম্যাচও এখানে হয়। তিন-চারটি টালির চালাঘর পার্কের গেটের পাশে। কোনটি ক্লাব-ঘর, কোনটি ব্যায়ামের আখড়া। গেটের সামনেই নেতাজীর ব্রোঞ্জ-মূর্তি।

কোচ খুঁজে পেলেন না আনন্দকে।

"গেল কোথায় ছেলেটা ? বাড়ি কি কাছাকাছি ?"

"অন্তত দু কিলোমিটার।" বিনয়বাবুও পার্কের প্রান্তগুলিতে চোখ পাঠাচ্ছেন। এখন সব স্কুলেই গ্রীষ্মের ছুটি। সময়টা দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। গুটি তিরিশ ছেলে এবং কয়েকটি ফুটবল মাঠে নেমে পড়েছে। পুকুরেও ঝাঁপাঝাঁপি শুরু হয়ে গেছে। আনন্দকে তিনিও দেখতে পেলেন না।

"আনন্দ ফাস্ট বোলার হবার মত মেটিরিয়াল। এই বয়সেই এত পেস, এত কণ্ট্রোল, ভাবাই যায় না।"

"দারুণ ব্যাটও করে। এবারই ইডেনে সামার ক্রিকেট টুর্নামেণ্টে চল্লিশ বলে সেঞ্চুরি করেছে। ভীষণ পিটিয়ে খেলে।"

কোচ ঘাড় নাড়লেন। অর্থাৎ খবরটা জানেন। এরপর চেঁচিয়ে উঠলেন, "আহ্ সোবার্স, তুমিও গাভাসকারের মত ভুল ক'রছ··· ফরোয়ার্ড খেলার বল বেছে নাও, সব বলেই কি খেলে ? কোন বল ছাড়বে সেটা বিচার করা অনেক শক্ত ব্যাপার। তাছাড়া শরীর আর ব্যাটের মধ্যে অত ফাঁক থাকছে কেন ?"

বিনয়বাবু সেই ফাঁকে একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে, আনন্দ কোথায় গেছে রে ?"

"বোধহয় টেনিস দেখছে। কাল তো ফেরার সময় ওখানেই ঢুকে

পড়েছিল। আমাদের সঙ্গে আর ফেরেনি।"

সুরকির দুটি হার্ডকোর্ট তার পাশে আর একটি ঘাসের। আটটি ছেলে ও দুটি মেয়ে কেউ ফোরহ্যানডে কেউ ব্যাকহ্যানডে ক্রমান্বয়ে বল মেরে যাচ্ছে বেসলাইন থেকে। নাগাড়ে সার্ভিস করে চলেছে দুজন পাশের কোর্টে। বছর দশেকের দুটি ছেলে ঠোঁট কামড়ে নেটের এপার-ওপার করাচ্ছে বলটিকে অসম্ভব মনোযোগে। সাইড-লাইনের ধারে কোচ দাঁড়িয়ে।

আনন্দ ইতস্তত করে, তারপর কোর্টের একটু দূরে নীলপর্দা ঘেঁষে পাতা তিনটি বেঞ্চের একটিতে গিয়ে বসে। কেউ কিছু বলল না, তাকালও না। সে নিজের ক্রিকেট বুট ও সাদা ট্রাউজার্স টার দিকে তাকিয়ে কিছুটা অস্বস্তিবোধ করল। তার মত এরাও প্লেয়ার, সুতরাং, আনন্দ ভাবল, প্লেয়ার হিসাবে এরা আর-এক প্লেয়ারকে নিশ্চয়ই বেরিয়ে যেতে বলবে না। খুব ছোট থেকেই সে নেতাজী পার্কে আসছে। তখন আসত মেজদার সঙ্গে। মেজদা ক্রিকেট খেলত মিলন পল্লীতে। আনন্দ ক্রিকেট ফেলে টেনিস কোর্টের পাশে গিয়ে দাঁড়াত। টেনিস কেন যে তাকে টানে সে জানে না, বুঝতেও পারে না। হয়তো একা একা খেলতে হয়, লড়তে হয়, একাই জিততে হয়। ক্রিকেটও তাই। ব্যাটসম্যানকে একাই ব্যাট করতে হয়, ফিল্ডারকে একাই ক্যাচ লুফতে হয়। বোলারকেই শুধু অন্যের সাহায্য নিতে হয় কখনো কখনো। এটা তার কাছে অপমানকর মনে হয়। তাই সে চেষ্টা করে প্রতি বলে বোল্ড আউট করতে। ভীড়ের থেকে নির্জনতা তার ভাল লাগে, অন্যের সাহায্য নেওয়ার থেকে নিজের চেষ্টায় কাজ করা, দল বেঁধে চীৎকার করে খেলার থেকে মুখবুঁজে নিজের মধ্যে গুটিয়ে

যাওয়ায় তার আনন্দ বেশি।

টেনিস কোর্টের ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে বাঘের মত—কখনো ওৎ পেতে থাকা, কখনো থাবা মারা, কখনো ঝাঁপিয়ে পড়া। একই সঙ্গে স্লিপ ফিল্ডিং, ব্যাটিং আর ফাস্ট বোলিং। আনন্দ একদৃষ্টে লক্ষ্য করে সার্ভিসে ব্যস্ত দুজনের দিকে। হুবহু ফাস্ট বোলিং। ছুটে এসে বাঁ কাঁধ ব্যাটস্‌ম্যানের দিকে হতে হতে জমি থেকে শরীরটাকে একটু উঠিয়ে নিয়ে ডান পায়ের ভরে একটু পিছনে হেলে···তারপরই সার্ভিস আর বোলিং একই ব্যাপার। বাঁ হাত থেকে উঁচুতে ছুঁড়ে দেওয়া বলটা নামছে, ডান হাতের র‍্যাকেট আর ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত শরীরটা একই সঙ্গে সামনের দিকে ছিটকে যাচ্ছে বাঁ পায়ে ভর রেখে।

চশমাপরা ছেলেটির সার্ভিসে জোর নেই। লক্ষ্য করতে করতে আনন্দর মনে হল, এই ভুলটা তারও হতো এবং অনেকটা কমাতে পেরেছে গত চার-পাঁচ দিনে। বল ছাড়ার সময় তার শরীরের ওজন বলের সঙ্গে না দিয়ে, পিছনে হেলিয়ে রাখত। এই ছেলেটিও বলে র‍্যাকেটের ঘা দেবার সময় পিছনে শরীরটা হেলিয়ে রাখছে। খুবই সাধারণ ভুল। এই ভুলটার কথা, তার ইচ্ছা করতে লাগল, ছেলেটিকে জানিয়ে দিতে।

টেনিস কোচ, অন্য কোর্টে ফোরহ্যাণ্ডে ব্যস্ত ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। উচিত হবে না, আনন্দ নিজেকে ধমক দিল, নিশ্চয় কোচের নজরে পড়বে, শুধরেও দেবে। তবু অস্বস্তি হচ্ছে। চমৎকার স্বাস্থ্য, প্রায় তার সমানই লম্বা, অথচ কী মিনমিনে সার্ভিস!

আনন্দ বেঞ্চে বসে ডানদিকে তাকিয়ে ছিল। চোখে পড়েনি বাঁ দিকের কোর্ট থেকে একটা বল বেঞ্চের দিকে ছিটকে এল। একজন

চেঁচিয়ে বলটা ছুঁড়ে দেবার জন্য বলতেই সে মুখ ফিরিয়ে দেখল তার পিছনে হাত পাঁচেক দূরে পর্দার নীচেই বলটা। শিথিল দেহটাকে বেঞ্চ থেকে তুলে দাঁড় করাবার আগেই আনন্দ দেখল, বেঞ্চের পিছন থেকে শিম্পাঞ্জির মত দুলতে দুলতে ছুটে গেল বলের দিকে এবং বলটা কুড়িয়ে কোর্টে ছুঁড়ে দিল সেই ছেলেটি, যাকে সে তাদের পাড়ার রাস্তায় মাঝে মাঝে দেখে।

নিঃশব্দে কখন যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল আনন্দ টের পায়নি। মাথা ভরা রুক্ষ চুল, জ্বলজ্বলে চোখ, গায়ে আধময়লা লাল-কালো চৌজ কটনের শার্ট। গায়ের চামড়া খসখসে, পালিসচটা কাঠের মত বিবর্ণ। ওর কাঁধ থেকে দেহটি কোমর পর্যন্ত ঝোঁকানো থাকে সর্বদা, যেহেতু ডান-পা পোলিওয় শীর্ণ সেহেতু বাম ঊরুতে হাত রেখে বাঁ দিকে ওকে ঝুঁকে থাকতে হয়। পা টেনে দুলে দুলে হাঁটে। বাঁ পা-টি ডান পায়ের থেকে একটু পুষ্ট। দুটি পা-কে মনে হয়, একটি তল্লা বাঁশ আর একটি কঞ্চি যেন মাটি থেকে উঠে নীল হাফ প্যান্টের মধ্যে ঢুকে গেছে। পায়ে নীল রঙের ধুলোভরা কেডস। ঠোঁট চেপে, শুধু দুটো চোখের মধ্য দিয়ে হাসছে কোর্টের দিকে তাকিয়ে। বয়স হয়েছে, অন্তত আনন্দের থেকে চার-পাঁচ বছরের বড়ই হবে। চোখের কোণে, ঠোঁটের কোলে বয়স লুকিয়ে আছে।

মস্ত বড় কাজ করেছে। বিরক্ত অপ্রতিভ আনন্দ আবার বেঞ্চে বসল। বলটা আমারই ছুঁড়ে দেওয়ার কথা, ওস্তাদি দেখাল আর কী। যেন ও ছাড়া আর কেউ কাজটা পারত না।

আনন্দ আবার তাকাল ওর দিকে, ওর পায়ের দিকে। অদ্ভুত অমানবিক ভঙ্গিতে দাঁড়ানো এবং দৌড়নোর দৃশ্যটা তার মনে কয়েক-বার ভেসে উঠল। যে দেখবে তারই করুণা হবে। এই করুণা নিয়ে

ওকে আজীবন কাটাতে হবে। হয়তো ও দারুণ গাইয়ে হবে, পণ্ডিত হবে, কবি হবে বা দারুণ ছবি-আঁকিয়ে হবে, কিন্তু আজীবন ওকে দেখেই সম্ভ্রম বা ভালবাসার আগে লোকের মনে প্রথমেই জাগবে করুণা। কী বিশ্রী ব্যাপারটা, আনন্দ ভাবল, মানুষের শরীর নিয়ে কি জঘন্য আমাদের ধারণা। এটাই যেন জীবনের একমাত্র জিনিষ। শরীরের আড়ালেই তো আসল জিনিষটা—মন, বুদ্ধি। তবু চেহারাটাই লোকে আগে চায়। চোখ সবার আগে যা দেখে তাই দিয়ে প্রথমেই ধারণা তৈরী করে দেয়। মন দিয়ে কি প্রথমেই দেখা যায় না? এবার মায়া হল তার। খেলা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। কোন খেলাই নয়। বেচারা! ক্ষমতা নেই, অথচ দেখে মনে হচ্ছে, খেলার খুব ইচ্ছে। কী ভীষণ ওর কষ্ট হয়, যখন অন্যদের খেলতে দেখে! আর-একটা টেনিস বল কোর্ট থেকে বেরিয়ে এল সোজা তার দিকেই। আনন্দ একটু ঝুঁকে ফিল্ড করতে পারত, করল না। বলটা বেঞ্চের তলায় গিয়ে পর্দায় লাগল।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অপেক্ষা করছে আনন্দ। ছুটে আসুক। বলটা কুড়িয়ে ছুঁড়ে দিক কোর্টে।

আসছে না। তাকাল সে। বাম উরুতে হাত রেখে কোমরটা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হল। আনন্দর মনে হল ও যেন চোখ দিয়ে জিজ্ঞেস করছে: তুমি নিজে ছুঁড়ে দেবে? যদি না দাও, তাহলে আমি ছুঁড়ব। দেবে ছুঁড়তে?

আনন্দ মাথা হেলাল।

চোখ দুটি উজ্জ্বল করে তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে ও হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আনন্দ লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে ওকে মাটি থেকে তুলল। কী হালকা, জিরজিরে শরীর। লজ্জা ঢাকতে আনন্দর মুঠো থেকে

বাহু দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে, "লাগেনি, আমার লাগেনি" বলতে বলতে তাড়াতাড়ি বলটা কুড়োবার জন্য এগিয়ে গেল।

"আন্দ, তুই এখানে। যা ভেবেছি। বাড়ি যাবি নাকি?"

আনন্দ টেনিস ক্লাবের গেটের দিকে হাত তুলে বন্ধুদের অপেক্ষা করতে বলে, কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি খুব খেলতে ইচ্ছে করে?"

ও প্রথমে না-শোনার ভান করল। আনন্দ আবার জিজ্ঞাসা করতে চাপা ঝাঁঝ নিয়ে বলল, "আমি খেলি।"

মুখটা এত কঠিন করে ও কোর্টের দিকে তাকিয়ে থাকল যে, আনন্দ ভরসা পেল না জিজ্ঞাসা করতে, কী খেলা খেল? অভিজ্ঞ পোড় খাওয়া বয়স্ক লোকের মত এখন ওর মুখটাকে দেখাচ্ছে। আনন্দর মনে হল, ও অনেক কিছু জানে বোঝে ভাবে।

নেতাজী পার্ক থেকে বাড়ি হেঁটে কুড়ি মিনিটের পথ। ফেরার পথে আনন্দ বন্ধুদের জানাল, টেনিস সার্ভিস এবং ফাস্ট বোলিং ব্যাপার দুটো একই জিনিস। শুধু তাই নয়, সেটা বোঝাবার জন্য হাতের কিটব্যাগটা নামিয়ে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। একটা ঢিল কুড়িয়ে খানিকটা ছুটে ডেলিভারি দিল।

"এবার সার্ভিসটা দেখা।"

আনন্দর মনে হচ্ছে, আবার শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে ধকল দিলে আবার সে শ্বাসকষ্টে পড়বে। বন্ধুরা কৌতূহলে তাকিয়ে। আনন্দ ভাবল, একটা সার্ভিস তো। কতটুকুই বা কষ্ট হবে।

আনন্দ সার্ভিস করল কাল্পনিক র‍্যাকেট ও বল নিয়ে। বন্ধুরা গভীরভাবে লক্ষ্য করল। একজন বলল, "তফাত আছে। একটা ছুটে

এসে ডেলিভারি, অন্যটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে।"

"তাহলেও", আনন্দ তর্ক শুরু করল। "মূল ব্যাপারটা একই। বল ডেলিভারি আর সার্ভিসের একটা সময়ে শরীরের সবকিছু একই নিয়মে চলে।"

"মোটেই না। কোন্ সময়টায় এক হয়?"

আনন্দ সেটা বোঝাবার জন্য পরপর বার তিনেক বল করার ও সার্ভিস করার মহড়া দিয়ে হাঁফাতে লাগল।

দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে একজন বলল, "অনেকটা মিল অবশ্য আছে বটে।"

আর-একজন কিছুটা হালকা বিদ্রূপ নিয়ে বলল, "বিজয় অমৃত-রাজের সার্ভিস তো দারুণ, ওকেই তাহলে ফাস্ট বোলার করে নিলে কেমন হয়?'

"টেনিসে নাকি বলে স্পিন-টিন করানো হয়, সত্যি নাকি রে আন্দ?…কী হয়েছে রে তোর, নেটেও দেখলুম হাঁপাচ্ছিস!"

"কিছু না, মাস্‌লে কেমন একটা টান ধরছে বল করলেই। একটু আস্তে হাঁট।"

আনন্দ বলতে পারল না, মাস্‌লে টান্ ধরাটা বাজে কথা। শুধু জ্বর হয়েছে বললে ওরা ভাববে ছেলেটা ননীর পুতুল। বরং 'মাস্‌ল পুল' শব্দটার মধ্যে যেন গায়ের জোরের ব্যাপারটা রয়েছে। কিন্তু ফাস্ট বোলারদের কি বুকের মাস্‌ল পুল করে? কাগজে তো লিলি বা রবার্টসের উরুর পেশীতে টান ধরার কথাই শুধু লেখে। ওদের কি এমন হাঁফ ধরার মত ব্যাপার হয় না? ওদের ফুসফুস কি কখনো গোলমাল করে না? করলে, টানা দশ-বারো ওভার বল করতে পারত না। তাহলে আমার ফুসফুসটাই কি বিগড়েছে?

মনে হওয়া মাত্র চুল থেকে একটা তরাস আনন্দর পায়ের আঙুল

পর্যন্ত নেমে গেল। তাহলে বিপজ্জনক কিছু কি একটা আমার হবে? কিংবা হয়তো হয়েছে। সে ঘাবড়ে গিয়ে চারপাশে একবার তাকাল। প্রতিদিনের মতই লোকেরা হাঁটছে, বাস মোটর রিক্সা চলেছে, শব্দ হচ্ছে, অন্যদিনের থেকে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু এখন তার চোখে পড়ল তিন তলার পাঁচিল থেকে একটি বাচ্চা মেয়ে প্রায় কোমর পর্যন্ত শরীরটা বার করে ঝুঁকে আছে, রাস্তার কল থেকে অযথা জল পড়ে যাচ্ছে, রেস্টুরেন্ট থেকে ওমলেট ভাজার গন্ধ নাকে এল, রেডিওতে কেউ আবৃত্তি করছে কবিতা। হঠাৎ যেন তার চারপাশের পৃথিবী তাকে স্পর্শ করতে শুরু করল। আনন্দ আশ্বস্ত হয়ে নিজেকে বলল, নাহ্, কিছু হয়নি।

॥ দুই ॥

হাতির চারটে পা জড়ো করলে যতটা ঘের হয়, এমন মোটা এক-একটা থাম। এইরকম চারটে থাম আনন্দদের বাড়ির ফটকে। তার পাশে দুটো পাম গাছ। বাড়ির মত ওদেরও বয়স একশো বছরের উপর। আনন্দর বাবা অনাদিপ্রসাদ কথায় কথায় একদিন, তাঁর কাছে শিক্ষানবীশ সদ্য-ওকালতি-পাশ দেবব্রতকে বলছিলেন, "কলকাতার এই দিকের ওয়ান-থার্ড জমি ছিল বাঁড়ুজ্যেদের। সিপয়-মিউটিনির আগের কথা। তখন রামমোহন-দেবেন ঠাকুরদের আমল। দত্তরা তখন কোথায় হে, সব জমিজমা ছিল আমাদের। এই শিবা দত্তর ঠাকুর্দা এইট্টিন সেভেনটিসিক্সে, আমাদের কাছ থেকেই পাঁচ বিঘে জমি পেয়ে বসত করে। সে এক মজার ব্যাপার।

"চোরবাগানের ঘোষেদের বেড়ালের সঙ্গে আমাদের বেড়ালের বিয়ে; আমার ঠাকুর্দার মা বিয়ের দিন সকালে বায়না ধরল বরযাত্রী যাবে একশো বেড়াল। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে তিনি শয্যা নিলেন। রৈরৈ পড়ে গেল—বেড়াল চাই, একবেলার মধ্যে একশো বেড়াল। বীরা দত্তর তেজারতি কারবার, কী একটা কাজে এসেছিল। বলল, আমি যোগাড় করে দোব, তবে বেড়ালপিছু এককাঠা জমি। করে দিল যোগাড়। সেই দত্তদের এখন অবস্থা দেখো। কপাল, কপাল। বীরা দত্তর ছেলে হীরা দত্ত কলকাতায় এগারোটা বাড়ির মালিক হয়। পরে এ বাড়িতে আর থাকত না। পালোয়ান ছিল। ক্ষ্যাপা মোষের

শিং ধরে মাটিতে ফেলে দিতে আমিই দেখেছি ছোটবেলায়। এই যে সামনের ছোট মাঠটা, শিবা দত্তর কারখানার পিছনে হে, যেটায় লরী রাখে, ড্রাম-ট্রাম পড়ে থাকে, ওটা তো এখানকার ছেলেদের খেলার জন্য দান করে গেছে হীরা দত্ত। পুরো জমিটা দশ কাঠার। বটতলা ইন্সটিট্যুট, লাইব্রেরি, একসারসাইজ ক্লাব সবই তো ওরই করে দেওয়া।"

অনাদিপ্রসাদের গল্প বলা বন্ধ হয় আনন্দর দিকে চোখ পড়তে। জিরাণ্ডিয়াল আর সিম্পল ইনফিনিটিভের মধ্যে তফাতটা দেবব্রতর কাছে বুঝে নেবার জন্য গ্রামার হাতে আনন্দ দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ সে অবাক হয়ে শুনছিল। সাধারণত সারাদিনে তার বাবা দু-চারটের বেশি কথা তার সঙ্গে বলেন না, মেজদা অরুণের সঙ্গেও নয়। সাংসারিক যাবতীয় কথা হয় হাবুর মা আর বিপিনের সঙ্গে। হাবুর মা ছাব্বিশ বছর এ বাড়ির রান্নাঘরের দায়িত্বে, চোখে কম দেখে; বিপিনকে একত্রিশ বছর আগে নিযুক্ত করেছিলেন আনন্দর ঠাকুর্দা। জুতো না পরে বাড়ির বাইরে যায় না। হুকুম দেবার তালিকায় এ বাড়িতে তার স্থান দ্বিতীয়।

আনন্দকে প্রায়শই পড়া বুঝে নিতে সাহায্যপ্রার্থী হতে হয় দেবব্রত অর্থাৎ দেবুদার। অনাদিপ্রসাদ প্রাইভেট টিউটর রাখার ঘোরতর বিরোধী। তাঁর ধারণা, ফাঁকিবাজ ছাত্রদের জন্যই বাড়িতে মাস্টার দরকার এবং তাই সেটা বাজে খরচ। আসলে অনাদিপ্রসাদ একটু কঞ্জুস, দেবব্রতকে দিয়ে পড়ানোর কাজটা করিয়ে নেবার জন্যই এই অজুহাত। দেবব্রত পাশের পাড়ার ছেলে, একটু ঘুমকাতুরে। আনন্দর বড়দা অমলের সঙ্গে স্কুলে এক ক্লাসে পড়ত। অমল যায় ডাক্তারীতে, দেবু ওকালতিতে। ছোট্টখাট্ট রোগা শরীর। চশমার দুটো কাঁচের পাওয়ার মাইনাস এইট এবং টেন। খুঁতখুঁতে এবং মানুষের

সঙ্গে মিশতে অনিচ্ছুক। যেখানে সেখানে, যখন তখন ঘুমিয়ে পড়ে। ওকালতি খুব একটা তার ভাল লাগে না। ভাল লাগে ঘুমোতে, ডিটেকটিভ বই পড়তে। ভীষণ ভক্ত ডিটেকটিভ মেইগ্রের।

মেইগ্রের মতই, দেবু সব ব্যাপার একটু তলিয়ে বুঝতে চায়। "সত্যসন্ধানী হওয়া উচিত মানুষমাত্রেরই", দেবু প্রায়ই বলে। "যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে তার পিছনে কারণ থাকবেই। সেটাই হল সত্য। সেটা খুঁজে বার না করলে শুধু আইন-টাইন দিয়ে সমাধান হয় না।" আনন্দ বলেছিল, "তাহলে একটা সমস্যার সমাধান করে দিন দেখি —আপনি যেখানে সেখানে কেন ঘুমিয়ে পড়েন?" দেবু থতমত হয়ে তারপর বলেছিল, "ঠিক আছে, রিসার্চ করে তোকে জানিয়ে দোব।" চারদিন পরই দেবু একটা কাগজে তার গবেষণার ফল লিখে এনে আনন্দকে পড়ে শোনায়—"ভাতই হল মূল কারণ। তারপরই চিনি দিয়ে তৈরী খাদ্য, আলু প্রভৃতি যাবতীয় কার্বোহাইড্রেট। মানুষের অন্ত্রনালিতে এগুলো গেঁজে উঠে ইথেনল তৈরী করে। এই জিনিষটার কেমিক্যাল নাম ইথেইল অ্যালকহল। বেশি পরিমাণে ভাত, মিষ্টি ইত্যাদি খেলে অন্ত্রে বেশি পরিমাণ ইথেনল তৈরী হয় যার ফলে শরীর ভার লাগে, চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে।" তারপর দেবু বলে, "এই ভাত খাওয়ার জন্যই বাঙালিরা কুঁড়ে। বুঝলি আনন্দ, আমি আজ থেকে ভাত খাওয়া ছেড়ে দিলুম। দুবেলা রুটি খাব।" আনন্দ খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, তিনদিন পর্যন্ত সে ভাতের বদলে রুটি খেয়ে থেকেছিল। দেবুর আর এক অভ্যাস মাঝে মাঝে বলে ওঠা, "আঃ, যদি লটারির একটা ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে যাই!"

মাস দুয়েক হল দেবু আর তাদের বাড়িতে আসে না। তার কারণটা এইরকম—কোর্টে সওয়াল করতে করতে অনাদিপ্রসাদ হাত

বাড়ালেন দেবব্রতর দিকে। টেবলে লাল মলাটের বাঁধানো তিনখানা একই আকারের হৃষ্টপুষ্ট বই দেবব্রতর সামনে। হাত বাড়ালেই সে জানে পরের পর কোন বই অনাদিপ্রসাদের হাতে গছিয়ে দিতে হবে। দুরাত্রি জেগে তিনি বার করেছেন, ছত্রিশ বছর আগে মাদ্রাজ হাইকোর্টে ঠিক এইরকম মামলায় যে রায়টি দেওয়া হয়েছিল। বইয়ের সেই পাতায় ফ্ল্যাপ দেওয়া আছে। মামলায় সেই পুরনো রায়টা তাঁর পাশুপত অস্ত্র।

হাত বাড়িয়েও বইটা হাতে না আসায় অনাদিপ্রসাদ তাকালেন, এবং দেখলেন, দেবব্রতর চোখ বন্ধ, চিবুক নেমে এসেছে বুকের কাছে। চাপা গর্জন হল একটা। ধড়মড়িয়ে উঠে দেবব্রত চোখ খুলে দেখল প্রসারিত একটি হাত এবং তখুনি টেবল থেকে একটা লাল বই তুলে হাতে ধরিয়ে দিল।

নাটকীয় ভঙ্গিতে ফ্ল্যাপ দেওয়া পাতাটি খুলে পড়তে গিয়ে অনাদিপ্রসাদের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। এটা পরের মামলার জন্য দরকার। তিনি আবার হাত বাড়ালেন। দেবব্রত ব্যস্ত হয়ে আর-একটা লাল বই দিল। হ্যাঁ, এইটাই, কিন্তু হায়, বইয়ে যে ফ্ল্যাপের টিকিও দেখা যাচ্ছে না। কীভাবে এখুনি বার করবেন রায়টা! অনাদিপ্রসাদ ফ্যালফ্যাল চোখে জজের দিকে আর জ্বলন্ত চোখে দেবব্রতর দিকে তাকান। মাথা চুলকে দেবব্রত বলল, "ফ্ল্যাপ তো স্যার দেওয়াই ছিল! কোথাও পড়েটড়ে গেছে বোধহয়, আমি খুঁজে দেখছি।"

ফ্ল্যাপ খুঁজতে, কোর্ট রুম থেকে দেবব্রত দুমাস আগে সেই যে দ্রুতবেগে বেরিয়েছিল তারপর আজও প্রত্যাবর্তন ঘটেনি। আনন্দদের বাড়ির ত্রিসীমানায় সে আর আসে না। কিছু বুঝে নেবার দরকার হলে আনন্দই যায় ওর বাড়িতে।

এখন নেতাজী পার্ক থেকে ফেরার পথে তার দেখা হল দেবব্রতর সঙ্গে। কালো কোট, সাদা টাউজার্স এবং হাতে একটা পেপারব্যাক ডিটেকটিভ বই। কোর্ট থেকে ফিরছে।

"দারুণ মুশকিলে পড়ে গেছে রে মেইগ্রে।"

দেবুদা বইটা মাথার উপর তুলে নাড়তে লাগল। "খুনী ওকে অফিসে ফোন করেছে, চিঠিও লিখেছে।"

"মুশকিলটা কোথায়!"

"খুনীটা মানসিক রোগে ভুগছে। বুঝলি না, এসব ক্ষেত্রে হয়তো আত্মহত্যা করে ফেলতে পারে।"

"যদি করেই, তাতে ক্ষতিটা কী? ধরা পড়লে তো ফাঁসিই হবে!"

"আহ্‌হা, বুঝছিস না। যদি আত্মহত্যা করে বসে, তাহলে তো কেউই জানতে পারবে না যে খুনীটাই মরেছে। প্যারিসে অমন কত লোকই তো রোজ মরছে। সুতরাং ওকে হাতেনাতে ধরতেই হবে। পাবলিককে দেখাতে হবে খুনী ধরা পড়েছে, নয়তো তারা নিশ্চিন্ত হবে কি করে? এদিকে মেইগ্রেকে দুদিন মাত্র সময় দিয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট।"

"কিসের সময়?"

"খুনীদের একটা সায়কোলজি আছে।" দেবুদা এধার ওধার তাকাল, "চল্, হাঁটতে হাঁটতে বলছি। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে খুন নিয়ে আলোচনা করাটা ঠিক নয়। ভাল উকিল হতে হলে ডিটেকটিভের বুদ্ধি রাখতে হয়। তোর বাবা তো এসব বোঝেন না। শিবা দত্তর উকিল হয়ে সারাজীবন শুধু ভাড়াটেদের সঙ্গেই মামলা করে গেল। ব্রেইন···মেইগ্রের মত ব্রেইন চাই উকিল হতে হলে।"

"কী যেন সায়কোলজির কথা বলছিলেন?"

"সায়কোলজি এমন ব্যাপার যা বই আর থিওরী দিয়ে বোঝা যায় না। জ্ঞান হয় বটে কিন্তু ভাল স্কুলমাস্টার কি ঔপন্যাসিক কি একজন ডিটেকটিভ যতটা ভালভাবে মানুষকে বোঝে তেমন ভাবে বুঝতে পারা চাই।"

"উকিলদেরও তো তাহলে ‥"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।" দেবু হঠাৎ চুপ করে গেল একজন পথিককে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখে। একটু দ্রুত হেঁটে এগিয়ে গিয়ে বলল, "তোর বাবার জুনিয়ার হয়ে থাকলে কোন অভিজ্ঞতাই হবে না।"

"বাবা তো খুনের কেস করে না।"

"সেই জন্যই তো ছেড়েছি তোর বাবাকে।"

"কি যেন সায়কোলজি সম্পর্কে বলছিলেন ?"

"খুনীদের মনস্তত্ত্ব! যেখানে খুন হবে সেখানে ওরা আসবেই। যাকে খুন করেছে তার ফিউনারালে নিশ্চয় যাবে এটা ধরে নিয়ে মেইগ্রে এক ফটোগ্রাফারকে বলল সেখানে উপস্থিত যাবতীয় লোকের এলোপাথাড়ি ছবি তুলে যাও। যদি একটা লোককে বেশির ভাগ ছবিতে পাওয়া যায় তাহলে তার পিছনে লোক লাগাবে। পাওয়া গেল একটা মুখ। কিন্তু অতবড় শহরে ওই মুখের লোকটাকে কী করে খুঁজে বার করা যায়!"

"কাগজে ছাপিয়ে দিক্। কেউ না কেউ চিনে ফেলে পুলিসকে জানিয়ে দেবে।"

"তুই যে ম্যাজিস্ট্রেটের মতই কথা বললি। সে তো মেইগ্রেকে দুদিন সময় দিয়েছে। খুনীকে হয় এর মধ্যে ধরে দাও, নয়তো ওই মুখটা কাগজে ছাপাতে পাঠাব। মেইগ্রে পড়েছে মুশকিলে। তার দৃঢ় ধারণা কাগজে নিজের ছবি দেখলেই খুনী নির্ঘাৎ আত্মহত্যা করে বসবে।"

"তাহলে ? মেইগ্রে কী করল ?"

"জানব কী করে, ট্রামে যা ভীড়, বইটা খোলার একটু চান্স পর্যন্ত পেলুম না।"

দেবুদার হাঁটার গতি হঠাৎ বেড়ে গেল। আনন্দকে ফেলে রেখেই সে হনহনিয়ে তার বাড়ির পথ ধরল বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে। মেইগ্রে কীভাবে মুশকিল থেকে বেরিয়ে এল সেটা তাড়াতাড়ি জানা যাবে, তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে বইটা শেষ করতে পারলে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে আনন্দ। বীরা দত্ত রোড শেষ হয়েছে যেখানে, তার পুবে দত্তদের রাধাগোবিন্দ মন্দির। পশ্চিমে বটতলা ইনসটিটিউটের একতলা বাড়ি আর খেলার মাঠ। মাঠের তিনদিকে—আনন্দদের বাড়ি, শিবা দত্তর কারখানার পিছন দিক এবং মহিম ব্যানার্জী লেন। কতকগুলো জীর্ণ একতলা কোঠাবাড়ি এবং টিনের চালার বাড়ি নিয়ে মহিম বাঁড়ুজ্যের গলিতে বটতলা নামে একটা পাড়া আছে। সন্ধ্যে নামছে। আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই রাস্তার আলো জ্বালতে হুক লাগানো লাঠি হাতে করপোরেশনের লোক সুইচ টিপে টিপে চলে যাবে বীরা দত্ত রোড দিয়ে। রাধাগোবিন্দ মন্দিরে কাঁসর-ঘন্টা বেজে উঠবে। ইনসটিটিউটের লাইব্রেরি খুলবে ডগুদা। কারখানা গেটের পাশে দয়ানিধির চায়ের দোকানের বেঞ্চে একটা-দুটো লোক হয়তো দেখা যাবে—ওভারটাইমের লোক।

মন্দিরের বাগান থেকে হাসনুহানার গন্ধটা আনন্দর ভাল লাগল। ভিতরে এল সে। ব্যাডমিণ্টন কোর্টের [illegible] শ্বেত পাথরের ঠাকুর দালান। শঙ্খের কাজকরা [illegible] ও থাম, [illegible] পাঁচ সারি কালো পাথরের সিঁড়ি, ঝাড়বাতি [illegible] হাতে কিটব্যাগ, পায়ে বুট, তাই সিঁড়ির থেকে তফাতে দাঁড়িয়ে আনন্দ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বিগ্রহের

দিকে। বুকের ব্যথাটা এখন বোধ হচ্ছে না। ফুলের মিষ্টি গন্ধ বুকভরে টানল। শ্বাসকষ্ট হল না। ঠাকুর দালানটার পুব দিক উন্মুক্ত। সকালের রোদে শ্বেত পাথর ঠিকরে ওঠে। বিকেলে জল দিয়ে ধোয়ার পর শীতল হয়ে যায়। আনন্দর ইচ্ছা হল খালি গায়ে শুয়ে পড়তে। চটি খুলে সে ঠাকুর দালানে উঠে এসে বসল। আর তখুনি মনে পড়ল মাকে।

সন্ধ্যার শ্বেত পাথরের মত ঠাণ্ডা ছিল মায়ের মেজাজ। প্রতি সন্ধ্যায় এসে আরতি না দেখলে ছটফট করত। ঠাকুর দালানে মা বসত চোখ বন্ধ করে, দুটি হাত কোলে রেখে, গলায় আঁচল, তার প্রান্তে চাবির থোকা। লালপাড় শাড়ির ঘোমটায় ঘেরা যেন কুমোরের হাতে গড়া মুখ। আনন্দ একদৃষ্টে তখন মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকত। হঠাৎ চোখ খুলে মা তাকাত। তারপর মুচকি হেসে আবার চোখ বন্ধ করত। ফিসফিস করে আনন্দ একদিন বলেছিল, "চোখ বুঁজে থাক কেন ?"

"চোখ বন্ধ করলে যে ভাল দেখা যায়।"

"কী দেখো ?"

"আমার আনন্দকে।"

চাপা বাষ্প বুক থেকে গলা পর্যন্ত উঠে আনন্দর দুটি চোখকে ভিজিয়ে দিল। ধীরপায়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এল রাস্তায়। কয়েকটা লরি, রিকশা ছাড়া বীরা দত্ত রোড দিয়ে সন্ধ্যার পর কোন যানবাহন যায় না। রাস্তাটা ফাঁকা। সামনে ইনসটিটিউটের জীর্ণ পলেস্তরাখসা ঘরের জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। ডগুদা এসে গেছে। খেলার মাঠে লরি দাঁড়িয়ে। তা থেকে লোহা নামাচ্ছে মজুররা। শিবা দত্তর কারখানায় তৈরী হয় সিলিং ফ্যান, সাইকেল, ওজনমেসিনের পার্টস এবং আরো কীসব যন্ত্রপাতি।

নিজেদের বাড়িটাকে প্রতিবারই দূর থেকে আনন্দর মনে হয় ছবিতে দেখা অতিকায় এক প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসোর। দোতলাটা অন্ধকার। মেজদা আসে দশটা-এগারোটায়। দালানের আলোটা জ্বললেও বাইরে থেকে বোঝা যায় না। সিং-দরজা দিয়ে একচিলতে আলো বাইরে পড়েছে। বাবা এখন হয়তো চেম্বারে, বিপিনদা বলে সেরেস্তায় বসেছে। রাত্রে শোবার জন্য ছাড়া বাবাকে দোতলায় দেখা যায় না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই এবং কোর্ট থেকে ফিরেই একতলার ঘরে ঢুকে পড়ে।

ফটকের পর প্রায় দশ মিটার মাটির পথ। বাড়িটার তিনদিকে অনেকটা জমি। একমানুষ উঁচু পাঁচিলে সেটা ঘেরা। দেউড়ির দশ ফুট উঁচু সিং-দরজাটার ডানদিকে রেলিং দেওয়া অন্ধকার রক। আনন্দ পৌঁছল রকের প্রান্তে ছোট্ট একটা দরজায়। সেটা দিয়ে ঢুকেই বেলে-পাথরের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে দরজাটাব পাশ দিয়ে। সিঁড়ির ঘুলঘুলি থেকে আনন্দ স্কেল দিয়ে মেপে দেখেছে দেয়ালটা ঠিক দু ফুট আট ইঞ্চি চওড়া।

সিঁড়িতেও আলো নেই। দোতলায় দালানেব আলোটাই কাজ চালিয়ে দেয় যখন, তাহলে আর দরকার কী? অনাদিপ্রসাদের এই যুক্তিটার প্রতিবাদ করে মেজ ছেলে অরুণ বলেছিল, ইলেকট্রিক বিল আমিই দেব।

"আমার মরার পর।"

অরুণ আর কথা বলেনি। শুধু গজগজ করে আনন্দকে শুনিয়ে বলেছিল, "মধ্যযুগীয়, ডিক্টেটরী, ফিউডাল মনোবৃত্তি। এই করেই সব সম্পত্তি গেছে। আমরা গরিব হয়েছি।"

আনন্দ জানে, এই বিরাট প্রাচীন বাড়িটা তাদের বনেদীয়ানা

জাহির করলেও, আসলে তারা মধ্যবিত্ত। বাবার ওকালতির রোজগারে সংসারটা মোটামুটি স্বচ্ছন্দে চলে যায়, এই পর্যন্তই। মেজদার একটা টাকাও বাবা নেয় না। মেজদা স্কুটার কিনেছে।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সে বুকে টান বোধ করল। দোতলায় পৌঁছে সে ভাবল, কী হল আমার! এটা কি ফুসফুসের অসুখ? তাহলে কি মার মত মরে যাব! দেয়ালে সার দেওয়া অয়েল পেইনটিং। সবাই পূর্বপুরুষ। ছবিগুলোর ক্যানভাসের রঙ চটা; কালো হয়ে গেছে! কারুর মুখ কারুব হাত বোঝা যায় শুধু হলুদ রঙেব জন্য। ছবিব সোনালি ফ্রেমের খাঁজে খাঁজে ধুলো। নির্জন দালানেব বিবর্ণ আলোয় মৃত মানুষগুলোকে দেখাচ্ছে যেন আর একবার মৃত্যুমুখীন। আনন্দর মনে হল, ওদের থেকেও সে এই মুহূর্তে বেশী নিঃসঙ্গ, বিপন্ন এবং ভীত। সারা বাড়িতে প্রাণের স্পন্দন আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

মোটা মোটা দেয়াল, ছাদ ভেদ করে শব্দ যাতায়াত করে না এ বাড়িতে। সাঁতস্যাতে ঠাণ্ডা মেঝে, কোণে কোণে ভ্যাপসা গন্ধ। ছবির মানুষগুলোর কেউ খালি গায়ে মোটা পৈতে ঝুলিয়ে, কেউ জোব্বা গায়ে পাগড়ি পরে বছরের পর বছর গোমড়া মুখে, বসে বা দাঁড়িয়ে। আনন্দ করুণ চোখে ওদের সকলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে শোবার ঘবে এল।

দোতলায় শোবার ঘর দুটি। বাড়ির দুই-তৃতীয়াংশ, পিছন দিকের প্রায় সবটাই আনন্দর ঠাকুর্দা বিক্রি করে দিয়েছিলেন হীরা দত্তকে। সেই অংশটা এখন শিবা দত্তর কারখানার গুদাম। সামনের দিকটায় আনন্দরা থাকে। হলঘরের মত লম্বা একটা ঘর, তার দুই প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে দুটি খাট। আনন্দ ও অরুণের। পাশের ঘরটা অপেক্ষা-

কৃত ছোট, অনাদিপ্রসাদ থাকেন। চার দেয়ালে চারটে দেয়াল-আলমারি এবং পাঁচফুট দীর্ঘ একটা আয়না ছাড়া ঘরের বাকী সবই আধুনিক।

আলো না-জ্বেলে, আনন্দ শুয়ে থাকে খাটে। খিদে পাচ্ছে। অপেক্ষা করতে লাগল হাবুব মা-র জন্য। এই সময় সে দিয়ে যায় দুধ আর সেঁকা পাঁউরুটি। হয়তো জানে না আনন্দ ফিরেছে। স্নান কবতে নীচে তো যেতেই হবে, তখন ববং খেয়ে নেবে।

ক্লান্ত আনন্দ কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙাল বিপিন। ঘবে আলো জ্বলছে। মেজদা বাইবের ব'রান্দায় ট্রানজিসটারে বি বি সি-তে কান পেতে রিলে শুনছে।

"ওঠো ওঠো, না খেয়ে শুয়ে কেন? দুবাব ডাকতে এসে ঘুবে গেছি।"

আনন্দ বিছানায় উঠে বসে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "বিপিনদা আমার বুকে কেমন একটা কষ্ট হয়। গাঁটে গাঁটে ব্যথা, শ্বাস নিতে পাবি না ছোটাছুটি করলে।"

"হবে না? দিনরাত লাফানি-ঝাঁপানি, চোট তো লাগবেই। মালিশ করে দোবখন। এখন খেতে চলো।"

ঘবে ঢুকল অরুণ। বিব্রত থমথমে মুখ। ট্রানজিস্টবটা কানে চেপে ধরে খাটে বসল।

"দুদিন বাকি, ম্যাচ বাঁচাতে পারবে?"

উত্তর পাবে এমন আশা আনন্দ করেনি তাই জবাব না পেয়েও সে আবার বলল, "ছশো উনত্রিশ আর ভারতের তিনশো দুই, তার মানে দুশো সাতাশ রানে পিছিয়ে, ইনিংস ডিফিট না হয়।"

অরুণ হাত তুলে ওকে চুপ করতে বলে আরো কুঁজো হয়ে চোখ-

মুখ কুঁচকে রেডিওটা কানে চেপে ধরল।

"টু ফর নান ছিল, এখন কত ?···গাভাসকর আছে তো ?"

আনন্দ উঠে এসে অরুণের গা ঘেঁষে বসল। ঘর্ঘর আজেবাজে শব্দের মধ্য দিয়ে একটা গলা উঠছে-নামছে। সাহেবদের বলা ইংরিজী আনন্দ ঠিকমত বুঝতে পারে না।

"হানড্রেড ফরটিটু না টু হানড্রেড ফরটিটু ঠিক বুঝতে পারছি না। এত ডিসটার্বেন্স হয়।"

আনন্দ কি একটা বলতে যাচ্ছিল, অরুণ হাত তুলে চুপ করতে বলে আবার বারান্দায় গেল। আনন্দ তোয়ালে নিয়ে ভাবল, স্নান করতে যাবে কি যাবে না। দেয়াল-ঘড়িতে রাত সাড়ে সাতটা। বারান্দায় অরুণ কুঁজো হয়ে, রেডিওর অ্যান্টেনাটা তার কান ঘেঁষে থরথরিয়ে কাঁপছে লাউডগার মত।

স্নান করে, খেয়ে, উপবে এসে দেখল অরুণ খাটে দুহাতে চোখ ঢেকে শুয়ে। আনন্দব পায়ের শব্দে তাকাল। আনন্দ স্কোর জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, তার আগেই অরুণ বলে উঠল, "শ্রেম, শ্রেম। ওনলি ফরটিটু—বিশ্বাস করতে পারা যাচ্ছে না, মাত্র বিয়াল্লিশ !"

"অল আউট বিয়াল্লিশে !" আনন্দও বিশ্বাস করতে পারছে না।

"মাত্র সতেরো ওভারে, পঁচাত্তর মিনিটে ইনিংস খতম ! কী লজ্জা !"

আনন্দব মনে হল, তার বুকের মধ্যে একটা ব্যস্ততা ভীষণ উত্তেজনায় ছটফট করছে। ধড়ফড় করছে একটা কিছু। ধীবে ধীরে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

"একজনও পেস খেলতে পারে না। পারবে কী করে, খেলেছে কখনো ? দেশে কি ফাস্ট বোলার আছে ?"

আনন্দ মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। মেজদাটা আপনমনেই গজ-গজ

করে যাচ্ছে। চোখ বুঁজল সে। সারা গায়ে যেন বেদনা চারিয়ে পড়ছে। হাঁটু কনুই কব্জি টনটন করছে। কপালে হাত রাখল। বোধহয় জ্বর আসবে।

"এত বছর ধরে শুধু কথা আর কথা। তৈরী করা উচিত, তৈরী করতে হবে, অথচ কাজের কাজ কিন্তু একদমই হল না। এতবড় একটা দেশে কেউ জোর বল করতে পারে না, জোর-বলে ব্যাট করতে পারে না! কী এমন বোলার ইংল্যাণ্ডের! আর্নল্ড আর ওল্ড। এই সেদিনই তো ওদের খেলল এখানে আমাদের এই ব্যাটসম্যানরাই, সিরিজও জিতল আব চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই এই অধঃপতন, বিয়াল্লিশ! ছি ছি ছি।"

আনন্দর চোখ ভারী হয়ে জড়িয়ে আসছে। রেডিওর ঘরঘর শব্দ যেন সে শুনতে পাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষেব চীৎকার আর উচ্ছ্বাস একসঙ্গে জট পাকিয়ে যাওয়ার মত শব্দটা। আনন্দর মনে হচ্ছে, তাকে ঘিরেই পাক দিচ্ছে বিরাট এই উচ্ছ্বাস। এখন আর সে শোবার ঘরের বিছানায় নয়, লর্ডসে। ইংল্যাণ্ড ব্যাট করছে। বল হাতে সে ছুটে যাচ্ছে প্যাভিলিয়নের দিক থেকে। চীৎকার উঠছে: "ফরটিটু··· ফরটিটু। রিভেন্জ, রিভেন্জ।" ছিটকে পড়ল অ্যামিসের অফ স্টাম্প প্রথম বলেই। পরের বলে এডরিচেব মিডল স্টাম্প। দুটো বলই অফ স্টাম্পের বাইরে পড়ে ছিটকে ঢুকে এসেছে। ডেভিড লয়েড ইয়র্কড হল তৃতীয় বলে। হ্যাটট্রিক! ইণ্ডিয়ার নতুন ফাস্ট বোলারটি ক্ষেপে উঠেছে, ইংল্যাণ্ডকে চুরমার করতে তাণ্ডব শুরু করেছে বল নিয়ে। এরপর গ্রীগ, ফ্লেচার, ডেনেস, নট—আসছে আর যাচ্ছে। ইংল্যাণ্ড অল আউট ফরটি ··না, থার্টি ফাইভ? ওয়ার্লড টেস্ট রেকর্ড নিউজি-ল্যাণ্ডের টোয়েন্টি সিক্স। তাহলে ইংল্যাণ্ডের টোয়েন্টি ফাইভ, পঁচিশ।

নতুন রেকর্ড···রেকর্ড। লর্ডসে আগুন ছোটাব, আমি, ইণ্ডিয়ার আনন্দ। সব লজ্জা অপমানের প্রতিশোধ নেব। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সে বিড়বিড় করল। অরুণ শুনতে পেল না।

"মেজদা, আমি ফাস্টবোলার হবো। কাল থেকে দারুণ প্র্যাকটিস করব। শুধু এই বুকের কষ্টটার জন্যই যা···"

সকালে, ঘুম ভাঙার পর আনন্দ সর্বাঙ্গে বেদনা এবং জ্বর-জ্বর বোধ করল। বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে হল না তার। উপুড় হয়ে বালিশে মুখ চেপে সে শুয়ে রইল।

খবরের কাগজের প্রথম পাঠক বাবা। সেটি বিপিনদা দোতলায় নিয়ে আসে সাড়ে সাতটায়। মেজদা কাগজটা পড়বে বিছানায় শুয়েই। তারপর পাবে আনন্দ। কাগজ পড়ার ইচ্ছা তার হচ্ছে না। মাথার মধ্যে যেন অনবরত বাম্পার চলেছে। চিড়িক দিয়ে লাফিয়ে উঠছে যন্ত্রণা। গাঁটে গাঁটে ব্যথা।

"মেজদা, ছাখো তো আমার জ্বর হয়েছে কিনা।"

অরুণ মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ভ্রূ কুঁচকে বলল, "গা গরম লাগছে? মাথা ভার-ভার?"

"হ্যাঁ, গায়েও ব্যথা।"

"ইনফ্লুয়েঞ্জা।"

অরুণ ওকে একগ্লাস জল ও একটা শাদা ট্যাবলেট দিয়ে, কপালে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, "এখন খুব হচ্ছে। চান করবি না, ভাত খাবি না, দুপুরে ঘুম, দেখবি সেরে গেছে। আর-একটা ট্যাবলেট রেখে দিচ্ছি, দরকার বুঝলে খাবি।"

ট্যাবলেট খেয়ে আনন্দ দুটো বালিশ মাথায় রেখে চিত হয়ে চোখ বন্ধ করল এবং ক্রমশ তার মনে হতে লাগল জ্বর কমছে, ব্যথাও

কমছে। মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখতে লাগল জুলপি বাঁচিয়ে দাড়ি কামানোয় ব্যস্ত মেজদাকে। গত তিনমাসে তিনরকম জুলপি রেখেছে। প্রথমে ছিল বাজারের মাংসওলাদের দা-এর মত যা দিয়ে টেংরির হাড় টুকরো করে। তারপর রেখেছিল নেপালিদেব কুকরির মত। এখন রয়েছে ক্রিকেট ব্যাটের মত।

"মেজদা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবার আসছে?"

"হুঁ।"

"অ্যাণ্ডি রবার্টস আসবে?"

সেফটি রেজার গাল থেকে তুলে অরুণ আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দুই জুলপির মাপ পরীক্ষা করতে করতে বলল, "আসবে না আবার! না এলে উইকেটগুলো নেবে কে?"

"আমায় একদিন খেলা দেখাবে, যেদিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ফিল্ড করবে?"

"দেখাব।"

"আমি শুধু অ্যাণ্ডির বোলিং দেখব।"

"কেন? কালিচরণ, রো, লয়েড—এদের ব্যাটিং?"

"আমি ফাস্ট বোলারের অ্যাকশন দেখব। কখনো দেখিনি। তুমি দেখেছ?"

"দেখেছি, ওয়েস হল।"

"লিণ্ডওয়ালকে?"

"নাহ্।" তোয়ালে-সাবান হাতে একতলার কলঘরে যাবার জন্য অরুণ দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল, "তুই নাকি জোরে বল করিস শুনলুম! আমাদের ক্লাবের শুভেন্দু দেখেছে নেতাজী পার্কে তোকে বল করতে। বলল, খুব পেস আর উইকেট থেকেও অনেকটা

ওঠে নাকি।"

আনন্দর কান দুটো গরম হয়ে গেল। লজ্জিত স্বরে বলল, "জোরে বল না হাতি। এখনো এন্তার শর্ট পীচ পড়ে। স্টাম্পের সাত হাত বাইরে দিয়ে যায়।"

"প্রথম-প্রথম ওইরকমই হয়। প্র্যাকটিস আর ধৈর্য—ওরেব্বাবা, আটটা বেজে গেছে!"

অরুণ চলে যাবার পর আনন্দর মুখ হালকা হাসিতে ছেয়ে গেল। কত জোরে বল করি মেজদাটা জানে না। প্যাণ্ট চাইলে, বুট চাইলে কিনে দিয়েছে, কিন্তু একদিনও আমার খেলা দেখেনি। এবারে সামার ক্রিকেটের সেঞ্চুরিটার পর কাগজে এ ব্যানারজি নামটা দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, তুই নাকি? হ্যাঁ বলতে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছিল। ওই রকম অবাক আবার করে দেব যেদিন কাগজে দেখবে ইণ্ডিয়া টিমে ওয়াড়েকর, এঞ্জিনীয়ার, তারপরই আনন্দ ব্যানার্জি···। ওর চিন্তাটা একটু থমকে গেল। আমি যখন টেস্ট খেলব ততদিনে ওয়াড়েকর এঞ্জিনীয়াররা তো রিটায়ার করে যাবে! অন্তত সাত-আট বছর তো লাগবেই টেস্টম্যাচ পর্যন্ত পৌঁছতে। হয়তো তিন বছরেই এসে যেতে পারি। কিংবা এমন যদি হয়, এই বছরেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এগেনস্টে! নেতাজী পার্কের ধার দিয়ে যাচ্ছিল সিলেক্টর পঙ্কজ রায়। নেট প্র্যাকটিস হচ্ছে দেখে, ক্রিকেটার তো, তাই মুখ ফিরিয়ে দেখতে দেখতে একটুখানি দাঁড়াল। তখন আমি বল করছি। তারপর আর চোখ ফেরাতে পারল না। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দেখে এগিয়ে এসে আমাকে হয়তো জিজ্ঞাসা করবে, তোমার নাম কি? কোন স্কুলে পড়ো? একটা কাগজে লিখে নেবে যাতে ভুলে না যায়। তারপর একদিন হঠাৎ টেলিগ্রাম আসবে স্কুলে—জয়েন টেস্ট ট্রায়াল ক্যাম্প

ইমিডিয়েটলি। মাদ্রাজ কি বোম্বাই কি বাঙ্গালোর, কোথাও হবে ক্যাম্পটা। একটা ভাল স্যুটকেশ দরকার তাছাড়া নিজস্ব ব্যাট প্যাড, গ্লাভস, ভাল বুট, দু-তিনজোড়া শার্ট-প্যাণ্টও চাই। আনন্দ আপন-মনে হাসল। মেজদার অনেক টাকা খসবে। তাতে ওর আপত্তি হবে না! মেজদাটা ক্রিকেট পাগল।

খেলার মাঠে লরির শব্দ এবং মজুরদের চিৎকার শুনে আনন্দ জানলা দিয়ে তাকাল। মাঠটা যেন কারখানারই মাল তোলা-নামানোর জায়গা। খেলার মাঝেই লরি ঢুকে পড়ে। তখন খেলা বন্ধ করে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকে না। আধঘণ্টা পর্যন্ত ছেলেদের দাঁড়াতে হয়েছে। তিনবছর আগে ফুটবল খেলার মধ্যে লরি ঢুকে পড়ায় ওরা কারখানার হেড দরোয়ানকে বলেছিল, তাড়া-তাড়ি মাল খালাস করে লরি সরিয়ে দিতে। লোকটা তাচ্ছিল্যভরে জবাবে বলে, এ জমি তো দত্তবাবুদের। তাদের লরি যতক্ষণ খুশি দাঁড়িয়ে থাকবে। একটি ছেলে বলেছিল, এ মাঠ তো ক্লাবের জমি। তাই শুনে দরোয়ান বলে, ক্লাব তো উঠে গেছে। এ-জমি এখন শিবা দত্তবাবুর। বেশী কথা বললে, খেলা বন্ধ করে দেব।

ছেলেরা বুঝতে পারছিল না, ব্যাপারটা নিয়ে কার কাছে নালিশ জানাবে। পাড়ার ছেলেরা চাঁদা তুলে বল কিনে নিজেরাই মাঠে নেমে পড়েছে। তাদের কোন ক্লাবও নেই। তবে অন্য দলের সঙ্গে ম্যাচ খেলার সময় নাম নেয় বটতলা ইন্‌স্‌টিট্যুট। কিন্তু ইন্‌স্‌টিট্যুটের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। না থাকার কারণ, ফুটো ছাদের জীর্ণ একতলা বাড়ি, টিমটিমে একটা লাইব্রেরি, মরচেধরা আধভাঙা কিছু ডাম্বেল, মুগুর ইত্যাদি ছাড়া এখন ইন্‌স্‌টিট্যুটের কোন অস্তিত্ব নেই। লাইব্রেরির কয়েকজন মেম্বার ছাড়া আর কোন লোকের যাতায়াত

নেই। বছর বারো আগে আনন্দর বড়দা অমলের উদ্যোগে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবই ছিল শেষ অনুষ্ঠান। একটা কমিটি আছে। বহু বছর তার নির্বাচন হয়নি। কমিটির প্রেসিডেন্ট শিবা দত্ত, সম্পাদক অনাদিপ্রসাদ।

কিছু ছেলে আনন্দকে বলেছিল, চল তোর বাবাকে গিয়ে বলি। কয়েকজন বলে, আগে প্রেসিডেন্টের কাছে যাওয়াই উচিত। কিছুক্ষণ বিতর্কের পর স্থির হয়, সবার আগে ডগুদার কাছে যাওয়াই ভাল। বাড়ি ছিল না ডগুদা। পরদিন সকালে ওরা ডগুদার সঙ্গে দেখা করে। আনন্দ যেতে পারেনি।

কী কথা হয়েছিল শিবা দত্তর সঙ্গে, ডগুদা তা আর বলেনি। তাদের শুধু বলেছিল, "বিকেলে লরি ঢুকবে না, মাঠের মধ্যে মাল রাখাও হবে না—কথা দিয়েছে শিবা দত্ত। মুশকিল কী জানিস। এ মাঠটার তো কোন বাপ-মা নেই। যদি নিয়মিত সারাবছর জমজমাট করে খেলার ব্যবস্থা হয়, লোকজন খেলা দেখতে আসে, তাহলে কি আব লরি ঢুকতে সাহস পাবে? তোরা তো দু-চারদিন ফুটবল কিংবা ক্রিকেট পিটিয়ে বন্ধ করে দিবি, বাকী সময় তো পোড়ো জমি হয়েই থাকে মাঠটা।"

কথাটা ঠিকই। এই ছোট্ট জমিতে ছোটবেলাটা কাটিয়ে ছেলেরা বড় মাঠে চলে যায় বড় হওয়ামাত্র। আনন্দ ফুটবল খেলে না আর। ভাল লাগে না। টেনিস-বলে ক্রিকেট খেলার স্তরও পেরিয়ে গেছে। বটতলার মাঠ থেকে গতবছরই সে নেতাজী পার্কে চলে এসেছে। মাঠে এখন যারা খেলে, তাদের অনেকেই আনন্দর অচেনা। মাঠটাতে ঘাস নেই। বর্ষায় লরির চাকা যে গর্তগুলো করে, সেগুলো রোদে শুকিয়ে স্থায়ী হয়ে রয়েই যায়। যত্ন করার কেউ নেই। ডগুদার

কথাটাই ঠিক, এ-মাঠের বাপ-মা নেই। আসলে, মাঠটার মা নেই।

ঘুমটা ভাঙল দুপুরে। সকাল থেকে সে কিছু খায়নি। প্রচণ্ড খিদে পেটের মধ্যে দাউদাউ করছে। হাবুর মা ঘরের দরজার বাইরে ঠাণ্ডা মেঝেয় ঘুমোচ্ছে। ওকে জাগিয়ে কিছু খেতে দেবার কথা বললেই বিপদ। জ্বর হয়েছে শোনার পরই বার্লি এনে দেবার জন্য বিপিনদাকে বার দুয়েক বলেছে। আনন্দ ধরেই নিল, তার জন্য বার্লি তৈরী হয়ে আছে। পা টিপে টিপে হাবুব মার পাশ দিয়ে সে নিচে রান্নাঘরে এল। রাত্রের খাবার রান্না করাই থাকে। লাউ-চিংড়ি, ঘন মুগের ডাল, বেগুন ভাজা আর পেঁপের চাটনি ঢাকা দেওয়া রয়েছে। রাত্রে শুধু রুটি তৈরী হবে। প্রত্যেকটি থেকে কিছু কিছু নিয়ে খেয়ে আনন্দ ঝরঝরে বোধ কবল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সে রওনা হয়ে গেল নেতাজী পার্কের উদ্দেশে কিটব্যাগ হাতে।

॥ তিন ॥

"অ্যাণ্ডি, দেরি হল যে, বুকের ব্যথাটা কেমন ?"

"ঠিক হয়ে গেছে।" নেটের পিছনে মাটিতে বসে বুট পরতে পরতে আনন্দ বলল। কোচ কাছে এসে ঝুঁকে দাঁড়ালেন।

"নতুন বল রেখেছি তোমার জন্য। জোরে করবে না। আগে বলের সুইং কণ্ট্রোলে রেখে লেংথ আর ডাইরেকশ্যনে মাস্টারি আনা, তারপর পেসের কথা ভাবা যাবে। ফাস্ট বোলিং মানেই শুধু জোরে বল করা নয়। চকচকে বলের সঙ্গে আঙুলের ভাব জমাও।"

কোচ পকেট থেকে একটি বল বার করলেন। পাকা আপেলের রঙ। দেখেই লোভীর মত চিকচিক করল আনন্দর চোখ।

"কাউকে দিইনি এতক্ষণ। তরুণ ব্যাট করবে, টেকনিক ভাল, মাথাটা ঠাণ্ডা। ওকে মন দিয়ে বল করবে। মার খেলেও মাথা গরম করবে না। জোরে বল দেবার চেষ্টা করবে না। সুইংয়ে বিট করাই হবে তোমার উদ্দেশ্য।"

আনন্দর ভয় ছিল, বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানিটা হয়তো শুরু হবে। ইনসুইং গ্রিপে চার পাঁচ কদম ছুটে এসে পুরনো বলে কয়েকটা বল করল। শ্বাসকষ্ট হল না।

"ঠিক আছে," নতুন বল আনন্দর হাতে তুলে দিয়ে কোচ চেঁচিয়ে বললেন, "ডেনেস, হয়ে গেছে সময়, এবার টার্নার যাবে।"

দেবেশ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েই বেরিয়ে এল। এইমাত্র সে পরপর

তিনটে স্কোয়্যার-কাটে নেট ঝাঁকিয়েছে। তরুণ নেটে ঢুকে বিজ্ঞের মত লেগ স্টাম্পের সামনে ব্যাট খাড়া করে 'ওয়ান-লেগ' গার্ড চাইল একজন বোলারের কাছে।

নতুন বল নিয়ে আনন্দ এই যে প্রথম বল করছে, তা নয়। কিন্তু তিন আঙুলে ধরে, হাত থেকে ছাড়ার সময় কান-ঘেঁষা হাতটাকে অনেক উঁচু থেকে চাবুক মারার মত নামিয়ে আনা, তালুটাকে লেগ-সাইডের দিকে ফিরিয়ে রাখা—এভাবে কোনদিন বল করতে সে বাধ্য হয়নি। ভয়ে ভয়ে আস্তে বল করতে লাগল। মাথার মধ্যে আছে শুধু একটা কথা—লেংথ এবং শুধুই লেংথ।

ত্বটো বল ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলে ও গোটাচারেক ছেড়ে দেবার পর তরুণ একটা ফুলটসকে অফ ড্রাইভ করল চমৎকার স্টাইলে। কান ত্বটো গরম হয়ে উঠল আনন্দর। বিড় বিড় করল : মাথা ঠাণ্ডা, অ্যাণ্ডি, মাথা ঠাণ্ডা রাখো। শ্বাস নিতে সামান্য অস্থবিধা হচ্ছে। কিন্তু গ্রাহ্যে আনল না। এবার বলে একটু জোর আনল।

পিছিয়ে ব্যাকফুটে তরুণ গ্লান্স করল লেগ স্টাম্প থেকে। কোচ তারিফ জানিয়ে মাথা নাড়তেই আনন্দর মনের মধ্যে ঈর্ষা চুলকে উঠল। নেটে আবো তিনজন বল করছে। তাদের বল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বলটা নেটের মধ্যে পড়ে রয়েছে। সে নেটের দিকে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

"কী লাভলি, আলতো করে ঘুরিয়ে দিল দেখলি। নিখুঁত টাইমিং!"

"তরুণের লেটকাটও দেখার মত। সূক্ষ্ম মারগুলো ওর হাতে দারুণ খোলে। অফ স্টাম্পের বাইরে একবার বল পাক্, দেখবি কি চমৎকার কাট্ করবে।"

"এই আন্দ, দে তো একটা অফ স্টাম্পের বাইরে একটু শর্ট পীচ।"

ওরা তরুণের বন্ধু। আনন্দ ছেলে দুটির দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বলল, "কেন ?"

"তরুণের লেটকাট দেখব।"

"দেখার আরো জিনিষ আছে ব্যাটিং ছাড়াও।"

ব্যাটের ঠোক্কর দিয়ে মেরে তরুণ বলগুলোকে বার করে দিচ্ছে নেটের ভিতর থেকে। নিজের বলটি কুড়িয়ে আনন্দ বলল, "ফাস্ট বোলিংও দেখার মত একটা জিনিষ।"

"যেমন তুই এখন করছিস। এর থেকে মেয়েরাও তো জোরে বল করে।"

ঝাঁ করে রক্ত ছুটে এল আনন্দর মাথায়। বটে! চোয়াল চেপে সে বোলিং মার্কে ফিরে এল। কোচ যা বলে বলুক, একটা বল অন্তত সুইং-টুইং সিকেয় তুলে জোরে, ভীষণ জোরে দেবে।

বলটা এত জোবে আসবে এবং গুডলেংথ থেকে আচমকা লাফিয়ে উঠবে, তরুণ কল্পনা করেনি। ফরোয়ার্ড খেলতে গিয়ে থমকে যায় আর ব্যাট তুলে মুখ আড়াল করার আগেই বলটা কপাল ঘষড়ে নেটের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আনন্দ তা দেখেনি। ডেলিভারি দিয়েই তার চোখ থেকে সব দৃশ্য মুছে অন্ধকার হয়ে যায়। ফুসফুসে সেই মুহূর্তে যেন একটা ছুরি গেঁথে গেল। ফলো-থ্রুর সঙ্গেই সে বুক চেপে বসে পড়ে। তার সারা বুকটা থেকে যেন দৈত্যাকার একটা মুঠো এখন কচলে কচলে বাতাস বার করছে। যখন সে মুখ তুলল, তখন নেট থেকে তরুণকে ওরা ধরে বার করে আনছে। সাদাজামায় টপটপ রক্ত পড়ছে।

চোখ বন্ধ করল আনন্দ। একি হল ? রক্ত কেন তরুণের মুখে ?

খুন করলাম নাকি, তরুণ কি মরে যাবে ? কেঁপে উঠল ওর বুক। অতি ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সে বোবাচোখে তাকিয়ে রইল তরুণকে ঘিরে-ধরা জটলার দিকে। ফার্স্ট-এইড বক্স দেখা যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে।

"খুব বেঁচে গেছে। যদি সোজা মুখে লাগত তাহলে—"

"কপাল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে বলেই আর কিছু হল না। বলটা গুড লেংথ থেকে লাফিয়ে উঠেছিল। বড্ড বাজে পীচ।"

"এই পীচে এত জোরে বল করতে দেওয়া উচিত হয়নি কোচের।"

"কোচ তো ও:কে আস্তেই বল করতে বলেছিল, আমি নিজে শুনেছি।"

"কিছু হয়নি, সামান্যই কেটেছে।" কোচ উবু হয়ে পীচ দেখছিলেন, এবার এগিয়ে এসে আনন্দর কাঁধে হাত রাখলেন। ফিকে হাসল আনন্দ।

"পীচটা ভাল করে রোল করা নেই। এই সব পার্কে শুধু জল দিয়ে যাহোক করে রোলার টেনে কি পীচ তৈরী হয়? কত তরিবত, মেহনত, সময় লাগে পীচ তৈরীতে।"

"বলটা আমি জোরে দিয়েছিলাম।"

"আস্তে বলও কি লাফায় না?" কোচ প্রায় ধমকে উঠলেন। "তুমি কি ভেবেছ তোমার জন্যই তরুণের লেগেছে? মোটেই না। বোলারের কাজ বল করা, ব্যাটসম্যানের কাজ বলটা খেলা। খেলতে পারেনি ও। বল থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়াও খেলার একটা অংশ। ওর লাগার জন্য দায়ী তারাই যারা পীচ তৈরী করেছে। বলটা না-লাফিয়ে গড়িয়েও তো যেতে পারত! তখনও কি তুমি এতটা দুঃখ পেতে? লেগেছে তো লেগেছে, খেলতে গেলে অমন একটু-আধটু লাগেই—তুমি মনখারাপ করছ কেন?"

"যদি মারাত্মক কিছু হয় ?"

"হতে পারে। সব খেলাতেই ভয় আছে, ঝুঁকি আছে। তাই বলে কি পৃথিবীতে খেলা বন্ধ হয়ে গেছে ? তবে এই ইনজুরিটা কোচিংয়ের ক্ষতি করল। মনে ভয় ঢুকে গেলে—কী ব্যাপার ?"

ছেলেটি ইতস্তত করে বলল, "প্র্যাকটিস কি আর হবে ?"

"নিশ্চয় হবে। চলো সবাই মিলে রোলারটা টেনে আনি। পীচটা রোল করে আবার শুরু হবে।"

কোচ যাবার জন্য এগিয়েও ফিরে এলেন। "ফাস্টবোলারের একমাত্র দুঃখ, স্টাম্প ওড়াতে না পারলে। এই দুঃখ যে দেবে তাকেই মেরে হটিয়ে দেবে ক্রিজ থেকে।"

রোলারটা থাকে পার্কের এককোণে। কয়েকজন সেটা আনতে গেল। আনন্দ কিছুটা ভয়ে এবং সঙ্কোচ নিয়ে এগিয়ে এল কপালে-ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা তরুণের কাছে। কিছু বলার আগেই তরুণ ওর দিকে কটমটে চোখে তাকিয়ে বলল, "নেক্সট টাইম, তোর ওই বলকে টেনিস ক্লাবের কোর্টে হুক করে পাঠাব।"

শোনামাত্র আনন্দর মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। ওর ভয় হচ্ছিল, তরুণ হয়তো ভাববে, তার কপাল ইচ্ছে করেই ফাটিয়েছে। হয়তো চিরকাল একটা রাগ বিদ্বেষ মনে পুষে রাখবে। কিন্তু এখন সে বুঝল ভয় করার কিছু নেই। হুক করতে না পারার অক্ষমতায় তরুণ নিজের উপর ক্ষেপে গেছে। মাথা কাত করে কথাটা মেনে নিয়ে সে হাত বাড়িয়ে দিল তরুণের দিকে। এতক্ষণ যে অস্বস্তিটা তাকে কুরে খাচ্ছিল সেটা বন্ধ হল।

"আমার কোন দোষ নেই।"

"ঠিক আছে।"

তারপর আনন্দ ছুটে গেল রোলার টানায় হাত লাগাতে। তরুণ তার উপর রাগ করেনি, এটা জানার পর, মন থেকে ভার নেমে গেছে। সে সর্বশক্তি রোলারে প্রয়োগ করেই বুঝল ভুল করেছে। বুকে চাপ পড়ে এমন কাজ কিছুতেই নয়। সে হাত নামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটি ছেলে বলল, "হল কী তোর? আজ অনেকবার দেখেছি বল করার পর হাঁপানিরুগীর মত নিশ্বাস নিচ্ছিলি।"

"কদিন ধরেই বল করলে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়!"

"ডাক্তার দেখা।"

ছেলেটি চলে যাবার পর, আনন্দ বিষণ্ণ বোধ করল। ডাক্তার দেখানোই উচিত। হয়তো এমন কোন গোলমাল যেজন্য আমার আর খেলা উচিত নয়। নিশ্চয় কোন অসুখ হয়েছে। মেজদা ছাড়া আর কাউকে বলা যাবে না ডাক্তার দেখাবার কথাটা। আনন্দ বার বার ভাবল এবং বিষণ্ণ হতে লাগল। হয়তো আর সে খেলতে পারবে না। ডাক্তার নিশ্চয় তাকে খেলা ছেড়ে দিতে বলবে। শ্বাস-কষ্ট যখন, নিশ্চয় তাহলে ফুসফুস কিংবা হার্টের ব্যাপার। খেলা তো এই দুটো জিনিষের উপর ভর করেই। ফাস্ট বোলিং গায়ের জোর আর দম ছাড়া সম্ভব নয়। তাহলে কি আমি আর খেলতে পারব না? কিংবা হয়তো সেরে যাব কিছুদিন চিকিৎসার পর। কিংবা ডাক্তার যদি বলে, খেলতে পার কিন্তু ছোটাছুটির খেলা নয়। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন্ খেলা আছে যাতে ছুটোছুটি করতে না হয়। লুডো, ক্যারম, তাস। ননসেন্স, তার থেকে মরে যাওয়াও ভাল। হ্যাঁ, মরে যাওয়া অনেক ভাল এই বুকের যন্ত্রণার থেকে।

আনন্দ বিষণ্ণ চোখে চারধারে তাকাল। সবাই কিছু না কিছু করছে। মানুষ চলছে রাস্তায়, গাড়ি চলছে রাস্তায়, মাঠে ফুটবল

খেলছে ক'টা ছেলে, ক্রিকেট বল লোফালুফি করছে নেটের পাশে তিনজন। আকাশে উড়ছে চিল। কেউ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। চলছে, উড়ছে, নড়ছে। কেউ লক্ষ্য করল না কিটব্যাগ হাতে তার চলে যাওয়াটা। সবাই ব্যস্ত রোলার টানায়।

টেনিস ক্লাবের পাশ দিয়ে যাবার সময় আনন্দ সামান্য ইতস্তত করল। প্র্যাকটিস চলছে তিনটে কোর্টেই। আজ যেন ছেলেমেয়েদের সংখ্যাটা বেশি। ঢুকে পড়ল এবং বেঞ্চে বসল এক মহিলার পাশে। আনন্দর মনে হল, ওঁর ছেলে বা মেয়ে ট্রেনিংয়ে রয়েছে।

গতকাল আনন্দ যাকে কোচ ভেবেছিল, সেই লোকটি হলুদ বুশশার্ট ও কালো ট্রাউজার্স পরে ক্লাবের অফিস-ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। এবার কোর্টের কাছে এল। আনন্দর পাশের মহিলাটিকে দেখে হেসে বলল, "ভালই করছে, খুব তাড়াতাড়ি পিক-আপ করছে ফাইনার পয়েন্টগুলো। ইনটেলিজেন্ট গার্ল।"

"বাড়িতে তো দিনরাত শুধু বিলি, ইভন, মার্গারেট, ক্রিস এইসব নামই জপছে। কী করি বলুন তো?"

"করুক না।"

"ওর বাবা টেবিলটেনিসের ভক্ত। এককালে খেলতেন তো। তিনি আবার ওয়াই-এম-সি-এতেও বুলুকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। বাপের সঙ্গে কীসব চীনে-জাপানী বলাবলি হয়, আমার আবার মনে থাকে না। কী যে করি, বুলুকে যে কোন্ খেলাটা ধরাবো ভেবে পাচ্ছি না।"

লোকটি হেসে কোর্টের ওধারে চলে গেল। আনন্দ বেঞ্চে হেলান দিয়ে ভাবল, এর মেয়ে নিজেই জানে না কি খেলা ভালবাসে। বাবা-মা জোর করে প্লেয়ার বানাচ্ছে। হয়তো মেয়েটার ইচ্ছে নাচ শেখার।

সে পা ছড়িয়ে অলসভাবে তাকিয়ে দেখতে লাগল প্র্যাকটিস। একবার সে এদিক ওদিক কাকে যেন খুঁজলও। মুচকি হাসি ঠোঁটে এসে মিলিয়ে গেল।

"র‍্যাকেটের মাথাটাকে মনে করবে তোমারই হাতের অংশ—হাতটা যেন লম্বা হয়ে গেছে। যখন এটা অনুভব কববে, র‍্যাকেট কণ্ট্রোল অনেক সহজ হয়ে আসবে।"

আনন্দ একটু ঝুঁকে একাগ্র হয়ে লোকটির কথা শুনতে শুনতে ঘাড় নাড়ল। ঠিক। শরীর আর খেলার জিনিসটা এক করে ফেলতে হবে। মেজদা মাঝে মাঝে ক্রিকেট ব্যাটটা জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকে। কিন্তু লীগের খেলায় ওর স্কোর বাষট্টির বেশী ওঠেনি। কিসের যেন অভাব আছে মেজদার মধ্যে। পঞ্চাশ পেরোলেই নার্ভাস হয়ে যায়। অথচ সবাই বলে ওর টেকনিক নাকি সাউণ্ড। শুধুই টেকনিক নয় আরো কিছু দরকার হয়। নার্ভ, সাহস।

"স্ট্রোক তিনরকমের, সার্ভিস, গ্রাউণ্ড স্ট্রোক আর ভলি। সব স্ট্রোকেই তিনটি জিনিস রয়েছে, বল মারার জন্য র‍্যাকেটটা শরীরের একধারে টেনে আনা, তারপর র‍্যাকেটটা সামনে চালানো, সবশেষে বল মারার পর বলের পথ ধরে শরীরের ঝোঁকে র‍্যাকেটটার এগিয়ে যাওয়া।"

"ঠিক ক্রিকেটের মত, ব্যাকলিফট, মারের পর ফলো থ্রু।"

চমকে পিছনে তাকাল আনন্দ। ভ্রূকুটি করল। ছ্যাঁত্ করে উঠেছিল বুকটা, কখন যে চুপিসাড়ে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা পায়ের উপর ভর দিয়েই হাঁটা, অন্তত ঘষ্ড়ানির শব্দও তো হবে। আশ্চর্য, কী নিঃশব্দ ভূতের মত।

আনন্দ অস্ফুটে বলল, "সব খেলাতেই তাই।"

"ক্রিকেট, হকি, টেবিলটেনিস, ব্যাডমিণ্টন, সব খেলাতেই এক নিয়ম।"

আনন্দর ইচ্ছা হল বলে, তুমি কি সব খেলা খেলে দেখেছ? একটা পা-এর তো ওই অবস্থা।

কিন্তু কিচ্ছু না বলে যথেষ্ট রকমের তাচ্ছিল্য দেখাতে ভ্রূ তুলে সে মুখটা ফিরিয়ে নিল। বাঁ ধারের কোর্টে ফোরহ্যানডে বল পেটাপেটি শুরু হয়েছে বেসলাইন থেকে।

"আমি অবশ্য খেলিনি, তবে লক্ষ্য করেছি।"

মনের কথা বুঝে নিতে পারে দেখছি! কান দুটো একটু গরম হয়ে উঠল আনন্দর। ও যা ভেবেছে আমি তা ভাবিনি, এটা এখুনি বুঝিয়ে দিতে হবে।

"এসব বোঝার জন্য খেলার দরকার হয় নাকি?"

"খেললে আরো ভালো বোঝা যায়। তবে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করালেও বোঝা যায়।"

ওরে ব্বাবা, এ যে দেখছি মন-টন নিয়ে খেলার কথা বলে।

আনন্দ মুখ ফিরিয়ে পিটপিট চোখে তাকাল ওর দিকে। সোজা তাকিয়ে আছে বেঞ্চের পিঠটা দুহাতে আঁকড়ে। আনন্দ আজ ভাল করে লক্ষ্য করল ওকে। চাহনিতে কোন ভাব নেই। চাপা গাল দুটোর মাঝখানে খাড়া নাক, ডগাটা পাখির ঠোঁটের মত বাঁকা। ঈষৎ বাদামী চুল, মনে হয় মাস ছয়েক ছাঁটেনি, বছর দুয়েক তেল দেয়নি, দিন দশেক চিরুনি। কনুই থেকে শিরাগুলো কব্জি পর্যন্ত রুগ্ন হাত দুটোকে বেঁধে রেখেছে।

ওর চোখে বিব্রত ভাব ফুটে উঠছে। আনন্দর মনে হল, ওকে এভাবে লক্ষ্য করাটা যেন পছন্দ করছে না। তাই সে ওর পায়ের

দিকে তাকাল ইচ্ছা করেই।

"পেন্সিলওয়।"

মুখ ঘুরিয়ে আনন্দ এবার অন্যদিক থেকে আসা কথায় কান দিল।

"ফোরহ্যানডটাকে মনে করবে যেন এক বালতি জল ছুঁড়ছো। বাঁ হাতে হাতল ধরে ডান হাতটা বালতির নীচে। বাঁ পা আর বাঁ কাঁধটা এগিয়ে দিয়ে পাশে ঘুরে দাঁড়িয়ে বালতিটা পিছনে নিয়ে তারপর হুশ করে ছুঁড়ে দেবে। বালতিটা এগিয়ে যাবে শরীর থেকে। ঠিক সেইভাবেই ফোরহ্যানড মারবে। বালতির তলার হাতটাই তোমার র‍্যাকেট-ধরা হাত।

"কখনো ড্রাইভ করেছ?" আনন্দ পাল্টা প্রশ্ন করল।

"বইয়ে ছবি দেখেছি।"

"কার ছবি?"

"আর্ট অব ক্রিকেটে, ব্র্যাডম্যানের।"

আনন্দ ঘুরে বসল। মেজদা গত বছর তার বন্ধুর কাছ থেকে বইটা দুদিনের জন্য চেয়ে এনেছিল। যতক্ষণ বাড়িতে থাকত বইটায় ডুবে যেত। অফিসেও নিয়ে যেত। আনন্দ একবার শুধু পাতা ওল্টাবার সুযোগ পায় মেজদা যখন সকালে কলঘরে গেছল, তার মুস্কিল ইংরাজী অক্ষরগুলোকে নিয়ে, অধিকাংশেরই মানে সে জানে না।

এই ল্যাংড়া ছেলেটা কোথা থেকে বইটা পেল?

"তোমার বই?"

কোর্ট থেকে একটা বল ছিটকে উড়ে আসছে আনন্দর পাশের মহিলাটির দিকে। "উউ বাবারে" বলে তিনি দুহাতে মুখ ঢাকলেন।

আনন্দ এক হাতে টেনিস বলটা লুফে নিল। ছুঁড়ে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে থমকালো। পিছনে তাকিয়ে হাসল। বলটা ওর দিকে এগিয়ে দিল।

ও হাসল। আনন্দর হাত থেকে বলটা নিয়ে ছুঁড়ে দিল কোর্টে।

"না, এখানে বসাটা ঠিক নয়।"

ব্যস্ত হয়ে মহিলাটি ক্লাব ঘরের সামনে পাতা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। ওরা দুজনে একসঙ্গে হাসল।

"ওর মেয়ে এখানে ট্রেনিংয়ে আছে, আবার টেবিলটেনিসও শিখছে।"

"জানি। ওই তো ফোরহ্যাণ্ড মারছে, চশমাপরা।"

"সবাইকে চেনো?"

"অনেকের নাম জানি।"

"বইটা তোমার?"

ও ইতস্তত করে বলল, "না, ঠিক আমার নয়, ডগুদা আমায় দিয়েছে। লাইব্রেরিতে উইয়ে ধরেছিল, বলেছে ফেরত না দিলেও চলবে। কেউ তো পড়ে না।"

আনন্দ অবাক হয়ে গেল। বাড়ির সামনেই লাইব্রেরিটা, অথচ সে জানত না। আক্ষেপে মন ছেয়ে গেল, কেন মেম্বার হয়নি। মেজদা বলেছিল, যারা ক্রিকেট শিখতে চায়, বইটা তাদের গীতার মত পড়া উচিত। আর সেই গীতাটাকে উইয়ে কেটে দিল লাইব্রেরির তাকে! একবার যদি কেউ বলতো, তাহলে মেম্বার হয়ে যেত। লাইব্রেরিতে গিয়ে কোনদিন সে ইংরেজী বইয়ের ক্যাটালগটাও যদি দেখত। মেজদাটাও কখনো লাইব্রেরির মেম্বার হয়নি। ওখানে নাকি মান্ধাতার আমলের বই আর মাসিক পত্রিকা ছাড়া কিছু নেই। অথচ

'আর্ট অফ ক্রিকেট' ছিল। এরকম হয়তো আরো অনেক বই পড়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করার জন্য মুখ ফিরিয়ে আনন্দ ওকে দেখতে পেল না। আসার মতই নিঃসাড়ে চলে গেছে। গলা লম্বা করে আনন্দ চারধারে খুঁজল। কয়েক পা গেলেই পর্দার আড়ালে চলে যাওয়া যায়। ওকে দেখা গেল না। উঠে খুঁজতে ইচ্ছে হল না তার। একা বসে তাকিয়ে রইল কোর্টের দিকে। এবং ক্রমশ ভারবোধ করতে লাগল সারাদেহে। সামান্য ঝিমুনি আসছে।

আনন্দ নিজের কপালে হাত রাখল, বোধহয় আবার জ্বর আসছে। অনেকটা হেঁটে বাড়ি, কিছু পয়সা থাকলে রিকশায় যেত। মেজদাকে আজই বলতে হবে। ও হয়তো বাবাকে বলবে। জ্বর-টর হলে বাবা বিরক্ত হয়। জ্বরের জন্য ডাক্তার দেখানো, ওষুধ কেনাটা বাজে খরচ মনে করে। মেজদা যেন বাবাকে না বলে। কিন্তু ডাক্তার যদি বলে, খেলা বন্ধ করতে হবে! যদি বলে তোমার দারুণ একটা অসুখ করেছে, খেলা একদম বন্ধ! চিরকালের মত বন্ধ!

ভয়ে কেঁপে উঠল আনন্দর বুক। সন্ধ্যা নামছে। পার্কের গাছ-গুলোয় একটানা কিচির-মিচির করে চলেছে পাখিগুলো, আনন্দ ভেবে পায় না কিজন্য রোজ সন্ধ্যায় গাছে ফিরেই সবাই কথা বলে। এত কী কথা ওদের! সে নিজে একদম কথা বলে না বাড়ি ফিরে। কার সঙ্গেই বা বলবে। তরুণের কপাল ফেটেছে তার বলে, এ-কথাটা বাড়িতে কাকে জানাবে? মেজদা তো আসবে অনেক রাতে।

যদি মা থাকতো।

আকাশের গাঢ় কমলা রঙের অংশটার উপর একসার কালো ফুটকি ভেসে উঠে সন্ধ্যার ধূসরতার মধ্যে প্রবেশ করতে দেখল

আনন্দ। ওরা পাখি। কোন বিল বা দীঘির দিকে চলেছে। কিংবা ওরা হয়তো সাইবেরিয়া থেকে আসা এখন আবার ফিরে যাচ্ছে। হাজারেরও বেশি মাইল উড়ে যাবে। কী জোর ওদের ডানায়, ওদের হার্টে। অবসাদে ক্লান্ত লাগছে তার। এইবার তার নিজেকে একা মনে হচ্ছে। শীতকালের ভোরে ঘন কুয়াশার আড়ালে দূরের রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া মানুষের মত এখন সে একা আবছা এবং বিষণ্ণ। মিলারকে দিয়ে টানা কুড়ি ওভার বল করিয়েছিল ব্র্যাডমান। স্ট্যামিনা, স্ট্রেংথ···স্ট্যামিনা, স্ট্রেংথ···কোথায় স্ট্যামিনা? বুকের মধ্যে কলকব্জা একটা বিগড়েছে।

কোর্ট থেকে ওরা চলে গেছে। আনন্দ একা বসে, উঠতে ইচ্ছে করছে না। নেট অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। তরুণ কি আজ আবার ব্যাট করেছে? পরপর দুদিন চোরের মত সে পালিয়ে এল। কী লজ্জা, আনন্দ ব্যানার্জি কিনা দু ওভার বল করেই টায়ার্ড। হাসবে, ওরা হাসবে।

বেঞ্চ থেকে উঠে, মন্থর পায়ে আনন্দ বেরিয়ে এল। ঘুম পাচ্ছে তার। হাঁটুতে ব্যথা, কনুইয়ে, কব্জিতে ব্যথা।

পালিয়ে যাচ্ছে আনন্দ!

আনন্দ মাথা নাড়ল। কিছু করার নেই, কিছুই করার নেই। বিয়াল্লিশ অল আউট। তার থেকেও লজ্জার এই ক্লান্তি। এই ব্যথা, হাঁফ ধরা। পরপর দুদিন পালিয়ে আসা। আমি জানি না আমি কী করব। জানি না, জানি না, জানি না।

রাতে আবার জ্বর এল। অরুণ তার কাছে এসে কপালে হাত রাখতেই চোখ খুলে কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আনন্দ হাতটা চেপে ধরল।

"মেজদা, আমি পালিয়ে এসেছি। আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, হাত পায়ে ব্যথা করে। আমায় ডাক্তার দেখাও। আমায় ভাল করে দাও। দু ওভারও বল করতে পারি না।"

ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল আনন্দর কণ্ঠস্বর। দুচোখ বন্ধ করতে করতে ফিসফিসিয়ে বলল, "তরুণ বলেছে হুক করে টেনিস ক্লাবে পাঠাবে। আমি ঠুকে দিয়েছিলাম বলটা, কিন্তু ওরা ভেবেছে পীচটা খারাপ তাই লাফিয়েছে। কেন আমার বল মারবে? আমি অপমান সহ্য করব না।···চ্যালেঞ্জ নোব, মেরে সরাব···সোবার্স, চ্যাপেল, বয়কট, লয়েড সবাইকে সবাইকে···আমাকে শুধু ভাল করে দাও, ভাল করে দাও, ভাল করে দাও।"

॥ চার ॥

"ডাক্তারবাবু, ভাল হয়ে যাবে তো ?"

চশমাটা টেবল থেকে তুলে চোখে লাগিয়ে ডাক্তার তাকালেন অরুণের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে। টাক ঢাকতে পিছনের চুল দিয়ে সযত্ন প্রয়াস রয়েছে ডাক্তারবাবুর মাথায়। বেঁটেখাটো মানুষটি এরকম আকুল কণ্ঠস্বর প্রতিদিন বহুবারই শুনে থাকেন বাড়িতে চেম্বারে বা হাসপাতালে। ব্যস্ত না হয়ে তিনি আড়চোখে একবার বাইরের দরজার পর্দাটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। পর্দার ওপারে, রাস্তায় নেমে যাওয়া সিঁড়ির ধাপে একজোড়া পা। আনন্দ দাঁড়িয়ে। রাস্তায় রবারের বল খেলছে পাড়ার ছেলেরা তাই দেখছে।

খেলা যত না হচ্ছে তার থেকেও বেশি চিৎকার করছে ছেলেরা। আনন্দ চেষ্টা করছে ঘরের মধ্যে মেজদা আর ডাক্তাবের কথাগুলো শুনতে, কিন্তু পারছে না। ঘরের মধ্যে যাবে কিনা ভাবল। বুক টিপটিপ করছে। ডাক্তাববাবু কি বলবেন, কে জানে! যতক্ষণ পরীক্ষা করছিলেন বলের ফ্লাইট লক্ষ্য করার মত সে সারাক্ষণ গম্ভীর নিরাসক্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিছুই সে বুঝতে পারেনি, বা তিনি তাকে বুঝতে দেননি।

প্রশ্ন হয়েছিল : "কদ্দিন থেকে এই রকম শ্বাসকষ্ট হচ্ছে ?"

"দিন পাঁচেক আগে নেটে বল করার সময়।"

"তার আগে কখনো হয়নি ?"

আনন্দ আড়চোখে অরুণের উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "হতো, খুব সামান্য।"

"কতদিন আগে থেকে? দুবছর? তিন বছর?"

আনন্দ মনে করার চেষ্টা করল।

"জ্বর হতো? সর্দি কাসি? গাঁটে গাঁটে ব্যথা?"

ডাক্তারের কাছে মিথ্যা বলতে নেই, লুকোতে নেই। আনন্দ ঘাড় নাড়লো।

"কাউকে জানাওনি?"

আনন্দ কয়েক সেকেণ্ড অরুণের মুখ লক্ষ্য করে বলল, "না, আপনা থেকেই সেরে যেতো তাই কাউকে বলতাম না।"

"মাকেও বলোনি?"

গলা খাঁকারি দিয়ে অরুণ বলল, "আমাদের মা নেই। আনন্দ যখন আট বছরের তখন মারা যান, নিউমোনিয়ায়। অত্যন্ত চাপা ছিলেন, কাউকে কিছু প্রথমে বলেননি। আনন্দও মায়ের মত চাপা স্বভাবের হয়েছে।"

এক ঝলক হাসি আনন্দর মুখের উপর খেলে গেল। ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

"ক্রিকেট ছাড়া আর কিছু খেল?"

"ফুটবল খেলতাম, এখন আর খেলি না।"

"কোন্ পজিশনে?"

"লেফট উইং।"

"ছুটতে গেলেই শ্বাসকষ্ট হতো, তাই ফুটবল ছেড়েছ।"

প্রশ্ন নয়, কথাগুলো যেন ঘোষণার মত। ডাক্তারবাবু যেন জানেনই কেন আনন্দ ফুটবল খেলা ছেড়েছে। মরীয়া হয়ে সে বলল,

"পরে ব্যাকে খেলতাম। গত বছরও খেলেছি।"

"এ বছর ?"

"আমি ক্রিকেটটাই শুধু খেলতে চাই। চোট লাগলে বোলিংয়ে অসুবিধে হবে ভেবেই ফুটবল বন্ধ করেছি।" আনন্দ একটু বেশি জোর দিল 'ভেবেই'-র উপর।

ডাক্তারবাবুর মুচকি হাসিটায় বিব্রত হয়ে, আবার সে বলল, "পঙ্কজ রায় তো ক্রিকেটের জন্যই ফুটবল খেলা ছেড়েছিলেন।"

উত্তর না দিয়ে ডাক্তারবাবু আর একবার স্টেথস্কোপ দিয়ে আনন্দর শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করে অরুণকে বললেন, "ব্যাপারটা যে এই প্রথম, তা নয়। বছর কয়েক আগেই রিউম্যাটিক ফিভার শুরু হয়েছে। তখন গ্রাহ্য করেনি। চিকিৎসা না করে চেপে যাওয়ায়, ডাক্তারি পরিভাষায় এটা রিউম্যাটিক মাইট্রাল ইনকমপিটেন্সে দাঁড়ায়। সাধারণ সর্দি-জ্বর ভেবে চিকিৎসা না হওয়া আর অবহেলা, দুটো মিলে মনে হচ্ছে এখন অ্যাডভানসড স্টেজের দিকে এগিয়েছে। একস্-রে করা দরকার, দেখতে হবে এটি য়েল ফাইব্রিলেশন হয়ে গেছে কিনা।"

"খুব সিরিয়াস ধরনের কিছু কি ?" অরুণ কোনরকমে প্রশ্নটি করল। তার চোখে অজানা ভয় এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"হার্টের ব্যাপার। সেটা চলার একটা ছন্দ আছে। ছন্দটা বদলে গেছে। সুতরাং সিরিয়াস তো বটেই।"

আনন্দ দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "সারতে কতদিন লাগবে ? আমাদের কোচিং এখনো দিনদশেক চলবে। তার আগেই—"

ডাক্তারবাবু গম্ভীরমুখে মাথা নাড়ছেন দেখে আনন্দ থেমে গেল।

"বন্ধ। একদম বন্ধ। কোনরকম পরিশ্রম নয়, সিঁড়ি ভাঙা পর্যন্ত

বন্ধ। খুব আস্তে হাঁটাচলা করলেও করতে পার। উত্তেজনা আসতে পারে এমন কোন ব্যাপারে যাবে না, চিন্তাও করবে না। নুন খুব কম খাবে। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ যা লিখে দিচ্ছি তাই নিয়মিত খাবে, বৃষ্টিতে ভেজা একদম বারণ, মাটিতেও শোবে না।"

"খেলা একদম বারণ?" আনন্দ বিশ্বাস করতে পারছে না।

"হ্যাঁ বারণ," তারপর অরুণকে প্রশ্ন, "বাথরুম কি দোতলায়?"

"না, একতলায়।"

"তাহলে ওকে একতলায় রাখার ব্যবস্থা করুন, যাতে সিঁড়ি ভাঙতে না হয়।"

অরুণ মাথা নাড়ল, কয়েক মুহূর্ত ভেবে আনন্দকে চাপা গলায় বলল, "তুই একটু ঘরের বাইরে যা, দু একটা কথা ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করব।"

বাইরে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আনন্দ কান পেতে রেখেছিল ঘরে। দু একটা টুকরো শুনতে পেয়েছে:

"দেখাশুনোর কেউ নেই…নিশ্চয়, ওকে গুরুত্বটা বুঝিয়ে দেব।"

"এর থেকে সেরিব্রাল এমবলিজম হতে পারে…পারমানেন্ট প্যারালিসিস…সাবধান না হলে…জোর করে করতে হবে। সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখা…মা থাকলে ভাল হত।"

রাস্তায় একটা গোল হল। চিৎকারের মধ্যেও আনন্দ বুকের ধক্‌ধক শব্দটা শুনতে পাচ্ছে। প্যারালিসিস মানে পক্ষাঘাত। শুধু বিছানায় শুয়ে থাকা। 'হবে, হতে পারে অর্থাৎ আমি সারাজীবন বিছানায় শুয়ে থাকব! কী অদ্ভুত।'

"চল্, যাই এবার।"

চমকে উঠল। চিন্তায় ডুবে ছিল, বুঝতে পারেনি অরুণ পাশে

এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, "ওই ছেলেটা ড্রিবল করছিল দারুণ, দেখবে ?"

স্কুটারে স্টার্ট দিয়ে শুকনো গলায় অরুণ শুধু বলল, "তাই নাকি।"

গম্ভীরমুখে সে সারাপথ স্কুটার চালিয়ে এল। ট্র্যাফিকের লাল আলোয় একবার থামতে হয়। তখন অরুণ পিছনে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, "একতলায় আমাদের একটা ঘর পড়ে আছে না? কি আছে ওটায় ?"

"ভাঙ্গা সোফা, ঝাড়বাতি আরো কীসব আছে। খুব আরশুলা ঘরটায়। প্রায়ই বিছে বেরোয়।"

আনন্দ আঁচ করতে পারছে মেজদার মাথায় এখন কি চিন্তা। একতলার ঘরটায় তার থাকার ব্যবস্থার কথা ভাবছে। কিন্তু ওঘরে বাস করার কোন ইচ্ছেই তার নেই। সে আর একবার যখন আরশুলা-বিছের কথা বলতে যাচ্ছে তখনই স্কুটারটা ছেড়ে দিল। মেজদার চোয়াল অযথা শক্ত হয়ে গেছে দেখে সে বুঝল কোন অনুনয়েই কাজ হবে না।

আনন্দর থাকার জন্য সেইদিনই ঘর নির্দিষ্ট হল একতলায়।

বাড়ির পিছনদিকে ছোট্ট এই ঘরটা বহু বছর পড়ে ছিল। বাড়ির লোকে ভুলেই গেছল ঘরটার কথা। উত্তরের জানলা খুললেই ঝোপ-ঝাড় ছোটখাট জঙ্গল। তারপরে একটা জলা জমি। জানালা ঘেঁষে বাড়ির পাঁচিল শুরু হয়েছে। দত্তদের কারখানার টিনের শেড আর চিমনিটা দেখা যায়। জানলার নিচেই পায়ে-চলা পথের দাগটা সাপের খোলসের মত পাঁচিল ঘেঁষে কারখানার পিছনের দরজায়

পৌঁছেছে। আনন্দদের বাড়ির অর্ধেকটায় যে গুদাম, তার সঙ্গে কারখানার যোগাযোগ এই পথ দিয়েও হয়। তবে লরি আসে সামনের দরজায়।

মিস্ত্রি আনিয়ে সারিয়ে, চূণকাম করে আনন্দর খাট বিছানা বই থেকে শুরু করে ব্যবহারের যাবতীয় জিনিস নিচের ঘরে আনা হল। ছোট্ট ঘরটা তাতেই যেন ভরে গেল। উত্তরে ছাড়াও পুবে একটা জানলা। সেটা খুললে বাড়ির বাগান তারপর পাঁচিল। বাগান বলতে কাগজিলেবুর গাছ, নিম গাছ, স্তূপাকার পোড়ো ইট, জংধরা টিন, সিমেন্টের ভাঙা রক আর এক হাঁটু ঘাস।

ঘরের ভিতর দিকেও একটা জানলা। অনেক টানাটানি করে অরুণ সেটা খোলে। অনাদিপ্রসাদের চেম্বারের দরজার মুখোমুখি জানলাটা। অরুণ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেয়।

"দু-একদিন লাগবে ঘরের গন্ধটা কাটতে। তারপরই ঠিক হয়ে যাবে। একটা পাখা লাগবে, কালপরশুই কিনে আনব। একটা ঘড়ি হলেও ভাল হয়। আলনাও দরকার।"

আনন্দ খাটে বসে দেখছিল কথা বলতে বলতে অরুণের পায়চারি। একা একটা ঘরে এবার থেকে দিন-রাত কাটাতে হবে ভাবতেই তার গা ছমছম করে উঠছে। কৌতূহলও হচ্ছে। ব্যাপারটা কেমন লাগবে কে জানে। অনেক রাত পর্যন্ত গল্পের বই পড়া যাবে, আলো নিভিয়ে দিতে বলবে না কেউ। এই সুবিধেটা ছাড়া আর কী লাভ হচ্ছে।

"মেজদা, আমার কি অসুখ করেছে?"

"কিছু না, সামান্যই", অরুণ হাসবার চেষ্টা করে বলল। "অসুখ অনেক রকমের হয়, কোনটায় সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন করতে হয়,

কোনটায় দীর্ঘদিন অষুধ আর খাওয়াদাওয়ার রেস্ট্রিকশনে থাকতে হয়, কোনটায় শুধু ডিসিপ্লিনড হতে হয়। আন্দ, তোমায় ডিসিপ্লিনড হতে হবে।"

বিপিন দোতলার কুঁজোটা এনে রাখল। হাবুব মা তার নিজের বিছানা বালিশ এনে খাটের নিচে গুছিয়ে রাখছিল, বিপিন ধমকে উঠল ঃ "ওসব এখানে কেন ?"

"আন্দ কি রাতে একা শোবে নাকি ? ভয় করবে না ?"

"তোর তো নাক ডাকে, ও ঘুমোবে কী করে ?"

একটা ধুন্দুমার ঝগড়াকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে অরুণ বলল, "হাবুর মা রাতে এঘরে থাকুক। একজনের থাকা দরকার। আনন্দর চলাফেরা একদম বারণ। ঝগড়াঝাঁটি শুনলে উত্তেজনা হবে, তাতে ক্ষতি হতে পারে।"

অরুণের কথা শেষ হতে ওরা আনন্দর দিকেই তাকিয়ে ছিল। সে দেখল দু জোড়া চোখে ভীষণ মমতা, স্নেহ আর উৎকণ্ঠা। দেখে সে হাসল।

অরুণ তার পাশে খাটে বসল। জানলা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে আছে। কিছু একটা ভাবছে। আনন্দও চুপ করে মেঝের দিকে তাকিয়ে। সে কিছুই ভাবছে না। ঘরে আর কেউ নেই। জলার দিক থেকে ঘুঘুর ডাক ভেসে আসছে।

"আন্দ, তুই যথেষ্ট বড় হয়েছিস, নিজের ভালমন্দ বোঝার মত বয়স হয়েছে।"

অরুণ জানলার বাইরে চোখ রেখেই কথা বলে যাচ্ছে। ভারি থমথমে গলার স্বর। কারুর মৃত্যু সংবাদ বা গুরুতর দুর্ঘটনার খবর বলার সময় রেডিওর খবরপড়ুয়ার স্বর যেরকম হয়। মেজদা ওদের

সকলের থেকে ভাল খবর পড়ে দেবে।

"তোর অসুখটা খুব সিরিয়াস ধরনের।"

"কী অসুখ?"

"তোকে দারুণভাবে নিয়ম মেনে চলতে হবে। চব্বিশঘণ্টাই শুয়ে থাকা দরকার। শুধু বাথরুমে যাওয়া ছাড়া। শুয়েই খাওয়াদাওয়া করতে পারলে ভাল হয়।"

"আমি তো চলাফেরা দিব্যিই করতে পারছি, তাহলে?"

"এ ঘর থেকে একদম বেরুবে না।"

"ডাক্তারবাবু তো বললেন আস্তে আস্তে চলাফেরা করা যায়, শুধু সিঁড়ি ভাঙাই বারণ।"

"নিয়মিত ট্যাবলেট খেতেই হবে।"

আনন্দ চুপ করে রইল। অরুণের স্বর অধৈর্য বিরক্ত হয়ে উঠেছে। ভিতরে ভিতরে যেন আবেগের সঙ্গে সে যুদ্ধ করছে। চেপে নামিয়ে দিচ্ছে কিন্তু পারছে না। চোখ বড় হয়ে গেছে, মুখ লাল হচ্ছে। মেজদার ভিতরে একটা বেলুন ফুলে উঠছে। ফেটে যায় যদি!

"ঠাণ্ডা লাগাবে না। সারাক্ষণ জামা পরে থাকতে হবে। এঘরে বোধহয় পাখা দেওয়াটা ঠিক হবে না। সর্দি-কাশি কোনরকমেই যেন না হয়।"

অরুণ উঠে গিয়ে জানলাগুলো বন্ধ করে আবার খুলে কয়েকবার পরীক্ষা করল।

"বৃষ্টিতে ভেজা একদম বারণ, চটি আছে? আচ্ছা কিনে আনব। খালি পায়ে হাঁটবে না কখনো। মেঝেয় ভুলেও শোবে না। বসবেও না।"

"না না না, কী হয়েছে আমার যে এত বারণ? এই তো

আমি হাঁটছি।"

আনন্দ পায়চারি শুরু করল।

"এই তো লাফাচ্ছি।"

"আন্দ!"

চাপা চীৎকার করে অরুণ হাত বাড়িয়ে আনন্দর হাত চেপে ধরল।

"ক্লাস টেন-এ যে পড়ছে, নিজের ভালমন্দ তার বোঝা উচিত।"

"কী আমার ভাল আর মন্দ? এইভাবে ঘরের মধ্যে সারাদিন নিয়ম মেনে, কী আমার ভাল হবে? আমি তো ঠিকই আছি। শুধু এই ব্যথাটা, এ তো সেরে যাবে। বল করার সময় বুকের মধ্যে যে ধড়ফড়ানি—"

"কোনদিন সারবে না।"

বলেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল অরুণের মুখ। আনন্দ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে।

"কোনদিনই না?"

"নিশ্চয় সারবে, ডাক্তারবাবু যা বলেছেন যদি সেইভাবে চলো। আন্দ···আন্দ তোর নিজের জীবন এখন তোর নিজেরই হাতে। সারাক্ষণ তোকে চোখে চোখে রাখবার কেউ নেই। নিজেকেই নিজে দেখবি।"

"যদি না দেখি?"

অরুণ চুপ করে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। বেলুনটা ফেটে চুপসে গেছে।

"আমার প্যারালিসিস হবে। আজীবন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।"

আনন্দ চেয়ারে বসল অরুণের মুখোমুখি। বিকেলের ফিকে সোনালি রোদ দূরে একটা নারকেল গাছের পাতার ভাঁজে ভাঁজে ধুলোর মত জমে। পুবের জানলা দিয়ে অরুণ দেখছে আষাঢ়ের মেঘ। আকাশের একটা কোণ থেকে গুঁড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে পিঠে একরাশ বৃষ্টি নিয়ে। দুজনেই ক্রমশ ধূসর ঝাপসা হতে লাগল ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে।

"আন্দ, আন্দ।"

ফিসফিস করল অরুণ। হঠাৎ আনন্দর মনে পড়ল তার মাকে।

"ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। আমি ঘুমোচ্ছিলুম। হাবুর মা ঘুম ভাঙিয়ে বলল, চল্ মা তোকে দেখতে চাইছে।"

"আন্দ তুই ফাস্টবোলার হতে চাস, তাই না?"

"বড়দা, বাবা, বিপিনদা, ডাক্তারবাবু, তুমি—সবাই তখন ঘরে ছিলে। হাবুর মা আমাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল মার কাছে। আমি চোখ মেলতে পারছিলাম না, এত ঘুম তখনো চোখে। মা অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হাসল, ডান হাতটা কাঁধের ঠিক এইখানে রেখে আমায় টানল। আমি মার বুকে মাথা রাখলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মা শুধু বলল, আন্দ আন্দ, লক্ষ্মী হয়ে থাকিস। তারপর বৃষ্টির একটানা শব্দটা আমাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিল।"

"আন্দ, লর্ডস মেলবোর্ন ব্রিজটাউন ইডেনে আগুন ছোটাবি। ইণ্ডিয়া রাবার আনবে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে।"

"বৃষ্টিতে আমি ভিজতুম। বৃষ্টি আমাকে মার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বৃষ্টি মায়ের মত সারা গায়ে হাত বুলোয়। আমার জ্বর হতো, তবু ভিজতুম। মেজদা, আর কি ভিজতে পারব না?"

"আন্দ, সারাদেশ গর্বে তোর দিকে তাকাবে। বলবে, হারা ম্যাচ, জেতা অসম্ভব, তবু জিতিয়ে দিল আনন্দ ব্যানার্জি। একা জিতিয়ে দিল। এমন ফাস্ট বোলিং পৃথিবীতে আগে হয়নি।"

"কিন্তু আমি জানি, আমি জানি।"

আনন্দ ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে মুখ রাখল অরুণের কোলে।

"কিচ্ছু জানিস না। কী জানিস···য়্যা, কী জানিস এইটুকু ছেলে ? সব অসুখই সারে। লক্ষ্মীছেলের মত কথা শুনলে সব অসুখই সারে।"

॥ পাঁচ ॥

জানলার ধারে ভোরবেলায় চেয়ারে বসে আনন্দ কৌতূহলে তাকিয়ে রইল মাঠের দিকে।

চেয়ারে বসলেই শুধু মাঠটার এক-তৃতীয়াংশ পুবদিকের জানলা দিয়ে দেখা যায়। বাকিটা ঢাকা পড়েছে কাগজিলেবু গাছটায়। বটতলা ইন্সটিট্যুটের খানিকটা দেয়াল আর লাইব্রেরির একটা জানলাও আনন্দ দেখতে পায়। এখন জানলাটা বন্ধ অর্থাৎ ডগুদা এখনো আসেনি। সাতটায় লাইব্রেরি খোলার কথা।

এই নিয়ে চারদিন ওরা মাঠে আসছে। গুটি সাতেক বাচ্চা মেয়ে এবং আর একজন, যাকে প্রায়ই আনন্দ রাস্তায় দেখেছে। কাঁধে রঙিন ঝোলা, কালোপাড় শাদা শাড়ি, গায়ের রঙ কার্বন পেপারের ঝকঝকে দিকটার মত, মুখটি লম্বাটে, সামনের দুটি দাঁতকে ঠোঁট কোনমতেই আড়ালে রাখতে পারে না। শুধু হাঁটার জন্যই ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। এমন মেরুদণ্ড সিধে রেখে, চওড়া কব্জির হাত-দুটো না দুলিয়ে, মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে, গ্যারি সোবার্সের চলনে কোন মেয়েকে আনন্দ হাঁটতে দেখেনি। সে আরো লক্ষ্য করেছে, প্রায় পুরুষদের মত বাইসেপসের গড়ন, আঙুলগুলো মোটা। পায়ে শাদা কেডস। বয়স, আন্দাজ করা শক্ত। তার মনে হয়েছে, তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে কোন একটা জায়গায়। আনন্দ ওকে লটারির টিকিট বিক্রি করতে দেখেছে। থাকে বোধহয় বটতলার পিছনের

কোন গলিতে। তার বেশি সে ওর সম্পর্কে কিছু জানে না। মেয়ে-গুলির বেশির ভাগই বটতলা পাড়ার।

মাঠটাকে পাক দিয়ে ওরা দৌড়চ্ছে। কাগজিলেবু গাছটার পাশ দিয়ে সেকেণ্ড দশেকের জন্য আনন্দ ওদের দেখতে পাচ্ছে। ধীরে, যেন লেফট-রাইট করতে করতে দৌড়চ্ছে। পা ফেলা শিখছে। একটি মেয়ের হচ্ছে না, আনন্দ এত দূর থেকেই সেটা বুঝতে পারছে।

মেয়েটি থেমে বাঁ দিকে তাকাল। লেবু গাছের আড়াল থেকে এগিয়ে এল—মনে মনে আনন্দ নামটা ঠিক করে ফেলে—'লেডি সোবার্স'। মেয়েটিকে কী বোঝাচ্ছে হাত নেড়ে, তারপর ঝুঁকে পা দুটো ধরে পর পর তোলা-নামা করিয়ে। এতদূর থেকে আনন্দ শুনতে পাচ্ছে না। স্টেপিংটা দেখাবার জন্য লেডি সোবার্স নিজেই ছুটতে গিয়ে হাঁটুতে শাড়ি আটকে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল।

আনন্দ চোখ বুঁজল সঙ্গে সঙ্গে। প্রায় কুড়ি সেকেণ্ড পর চোখ খুলল। মাঠের ওইখানটা ফাঁকা, কেউ নেই! এবার এল দুটি মেয়ে। ওদেব পিছনে, লেডি সোবার্স। অ্যাথলীটরা যেমন খাটো প্যাণ্ট পরে তাই পরনে। রঙটা আকাশী নীল। আনন্দ অবাক হয়ে গেল ওকে প্যাণ্ট পরা দেখে। এত বয়সী কেউ, অত খাটো প্যাণ্ট পরে এমন খোলা মাঠে! লোকজন যারা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে নিশ্চয় ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে বা দাঁড়িয়ে পড়ছে। আনন্দর কান দুটো গরম হয়ে উঠল। প্যাণ্টটা নিশ্চয় পরেই এসেছিল, ব্লাউজের মত শার্টটাও। নিশ্চয় একসময় দৌড়ঝাঁপ করত, ধরণধারণ দেখে তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু এই রকম রক্ষণশীল এলাকায় প্রকাশ্যে এমন পোশাক পরতে পারে এত বয়সে—এ কে?

আনন্দ এরপর অনেকক্ষণ আর ওদের দেখতে পেল না। কিছু

একটা করছে ওরা লেবু গাছটার ওধারে। দোতলার বারান্দায় গেলে দেখা যাবে, কিন্তু এঘর থেকে তার বেরোন নিষেধ। শিকারী নেকড়ের মত বিপিনদা ঘুরে বেড়ায় ঘরটার কাছাকাছি, দোতলায় মেজদা এখনো নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে। নতুন টেবল ঘড়িটায় সময় দেখল আনন্দ : ছ'টা বেজে পঞ্চাশ। সূর্য এখনো মন্দিরের আড়ালে, তবে কারখানার চালার উপর রোদ পড়েছে।

ঘর থেকে সন্তর্পণে আনন্দ বেরোল। দোতলার বারান্দার তলায়, সিং-দরজার পাশের রকটা থেকে মাঠের অপরদিক দেখা যায়। মেয়েরা এখন কী করছে সেটা জানার জন্য কৌতূহলে সে মারা যাচ্ছে।

বিপিনদা বোধহয় দোতলায়। রান্নাঘর থেকে শব্দ আসছে, হাবুর মা এখন ব্যস্ত। প্রায় ছুটেই সে বাইরের রকে এল। একমাস পর এই প্রথম।

লেডি সোবার্স স্টার্ট-নেওয়া দেখাচ্ছে। মাটিতে দুহাত, একটা হাঁটু ভেঙ্গে মাটিতে ছুঁইয়ে রাখা। ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে বেড়ালের মত শরীরটা কুঁকড়ে, তারপরই ছিটকে যাওয়া। এত দূর থেকে আনন্দ দেখতে পাচ্ছে স্টার্ট নেবার সেকেণ্ড চারেক আগে ওর সারা শরীরটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে। হাতির শুঁড়ের মত কাঁধ থেকে নেমে আসা হাত দুটোর পেশীগুলো তীক্ষ্ণ হল, উরু থেকে পায়ের গোছ পর্যন্ত পাকানো রয়েছে ইস্পাতের স্প্রিং। মুখটা তুলে সামনে তাকিয়ে। গলার দুপাশে কান পর্যন্ত দড়ির মত পাকিয়ে উঠেছে মাংস, চোয়াল শক্ত আর চোখদুটো ঝকঝক করছে সকালের রোদে। কালো পাথরে কয়েক মুহূর্তের জন্য খোদাই করা একটা অদ্ভুত কাঠিন্য যা বেগবান হবার প্রতীক্ষায়। বিপুল প্রাণশক্তি বেঁধে রাখা আছে লেডি সোবার্সের এই ভঙ্গিতে, ছাড়া পেলেই সকালের এই নরম রোদকে জ্বালিয়ে

উৎখাত করে দেবে যেন। আনন্দর বুকের মধ্যে তিরতির করে উঠল ভয়।

কিন্তু ও কে? আনন্দ বিশ্বাস করতে পারছে না। কোমরে হাত রেখে। সরু কঞ্চির মত ডান পা। শরীরটা ডানদিকে হেলে রয়েছে। মেয়েদের থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে লেডি সোবার্সের স্টার্ট শেখানো দেখছে। বীরা দত্ত রোড ধরে ডগুদা তখন হনহনিয়ে আসছে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে।

ডগুদাকে দেখে ও বাঁ দিকে ঝুঁকে পা টানতে টানতে এগিয়ে গেল। লাইব্রেরির দরজার তালা খুলে ডগুদা ভিতরে ঢুকল। বেরিয়ে এল হাতে একটা বেলের আকারের লোহার গোলা নিয়ে, একে ওরা বলে শট! ইন্সটিট্যুটের টিঁকে থাকা যে ক'টি লোহার সম্পত্তি এখনো রয়েছে এটি তারই অন্যতম।

শটটা দুহাতে ধরে, ও দুলে দুলে ফিরে এল। ধপ্ করে মাটিতে ফেলে, তালু ঝাড়ল। অবাক হয়ে আনন্দ ভাবল, লোহাব বল কে ছুঁড়বে? ওই মেয়েবা না লেডি সোবার্স?

উত্তবটা একটু পরেই সে জেনে গেল। মেয়েরা একে একে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে। সাতটার পর ওরা থাকে না। হয়তো পড়াশুনো করতে হয়। লেডি সোবার্স শট নিয়ে ছুঁড়তে শুরু করল। তিনটে ইট সাজিয়ে সার্কল কবেছে। সার্কলের দিকে পিঠ ফিরিয়ে। ডান হাতে ধরা শট ডান গালে ঠেকিয়ে কুঁজো হয়ে। বাঁ পা জমি থেকে তোলা। স্ট্যাচুর মত কয়েক সেকেণ্ড নিথর, তারপরই ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে উঠল। ডান পায়ের উপর ভর করে তিনটে ছোট্ট লাফে সার্কলের কাছে পৌছেই শরীরটা ঘুরিয়ে নিয়ে বাঁ পা মাটিতে ফেলল। ডেলিভারি দেবার ঠিক আগে যেন—তারপর সারা শরীরের মাসল

টানটান। সব জোর গুটিয়ে এসে কাঁধে, সেখান থেকে ডান বাহু বেয়ে উঠে এল শট ধরা মুঠোয়। "আ আ আহ্" চাপা একটা গোঙানির মত আওয়াজ এতদূর থেকেও আনন্দ শুনতে পেল। তারপরই লোহার গোলাটা হাত থেকে উড়ে বেরিয়ে এল। মাটিতে পড়তেই ধপ্ শব্দ হল একটা।

ও প্রায় পনেরো হাত ছুটে গেল, দুলতে দুলতে। একটা ভাঙা ইটের ছুঁচলো টুকরো দিয়ে আঁচড় কাটল যেখানে গোলাটা পড়েছে। তারপর সেটা দুহাতে ধরে ফিরে এল লেডি সোবার্সের কাছে। আনন্দ হেসে ফেলল। সর্বত্র এই ওর কাজ, ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু সারাজীবন কি ওর এইভাবেই চলবে! খাওয়া-পরার জন্য তো ওকে কাজকম্মো করতে হবে, চেষ্টা না করলে কি কাজ পাওয়া যায়? তাছাড়া কে ওকে কাজ দেবে? খোঁড়া লোকেরাও চাকরি করে কিন্তু তারা লেখাপড়া জানে। ও তো স্কুলে পড়ে বলে মনে হয় না।

পিছনে গলা খাঁকরি হতেই আনন্দ চমকে কুঁকড়ে গেল। তাকিয়ে দেখল, বাবা।

"এখানে?"

"এই দেখছি, কেমন প্র্যাকটিস করছে শট পাট।।"

অনাদিপ্রসাদ এগিয়ে এসে মাঠের দিকে তাকালেন, ভ্রূ কুঞ্চিত হল।

"অসভ্যের মত পোশাক, এসব কী! মেয়েছেলের এ কী বেশ!"

আনন্দ একপা একপা পিছোচ্ছে।

"তুমি দেখছিলে?"

"এইমাত্র আমি এলাম।"

"হুম্।"

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। ডান দিকে ঘুরেই আনন্দ ছুটে ঘরে এল। অনাদিপ্রসাদের গলা শোনা গেল, বিপিনদাকে ধমকাচ্ছেন আনন্দর উপর নজর রাখায় অবহেলার জন্য।

সারাদিন কিছু করার নেই। মেজদার এনে দেওয়া গল্পের বই পড়া আর বিলিতি খেলার ম্যাগাজিন দেখা ছাড়া। ছবিগুলো দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। ইংরাজী অক্ষরগুলোর অধিকাংশেরই মানে বুঝতে পারে না। আর বুঝতে না পারলে শুধু ছবি দেখে কি লাভ। বাড়ির কয়েকটি লোকের মুখ আর গলার শব্দ, এছাড়া আর কোন মানুষের মুখ সে দেখতে পায় না। পুবের জানলা দিয়ে দূরে, কয়েক হাত বাঁরা দত্ত রোড আর মাঠে লবি দাঁড়ালে কয়েকটা লোক দেখা যায়। শুধু একদিন দুপুরে খুব কাছ থেকে একটা লোককে দেখেছিল।

উত্তরের জানলা দিয়ে সে দূরে তাকিয়ে শুয়েছিল। বহু দূর পর্যন্ত আকাশ দেখা যায়। ঘন ঝোপগুলোর ওপাশে জলা। মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক ট্রেনের ভেঁপু বেজে উঠছে। আনন্দ কিছুই ভাবছিল না। শুধুই তাকিয়ে রয়েছিল। এমন সময় হঠাৎ জানলার গায়ের পথটা দিয়ে একটা লোক চলে গেল। পাঁচ-ছ সেকেণ্ড পরে লোকটা, যার একমুখ দাড়ি আর একরাশ পাকাচুল, পিছিয়ে এসে অবাক হয়ে জানলা দিয়ে ভেতরে তাকাল। কারখানার কেউ, হয়তো গুদামে যাচ্ছে। আগে কখনো সে এই জানলাটা খোলা দেখেনি।

আনন্দ চমকে উঠেছিল। প্রায় তিন হাত দূরে এমন বিদঘুটে একটা মুখ আচমকা হাজির হলে ভয় তো করবেই। হাত বাড়িয়ে জানলার পাল্লাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। বহুক্ষণ পরে পাল্লা খুলে এধার ওধার তাকায়। লোকটাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। বহুদিন সে বাইরের মানুষ দেখেনি। তারপর সে একটু একটু করে বিষণ্ণ হয়ে

পড়তে শুরু করে। খুব স্বাভাবিক, সাধারণ বিষণ্নতা। দীর্ঘদিন মানুষ না দেখলে, বাইরে বেরোতে না পারলে, এরকম সকলেরই হয়। এই নিয়ে নালিশ করা যায় না। করবেই বা কার কাছে। প্রতিদিন সকালে আর রাতে মেজদা আসে। তাকে কিছু বলা যাবে না এই নিয়ে। বেরোনোর কথায় একদমই কান দেবে না।

আনন্দ আপনমনে মাথা নাড়ল। মনটা ভার লাগছে। সকালে মেয়েদের ছোটা দেখে তার নিজেরও ইচ্ছা করেছিল, মাঠে গিয়ে ছুটতে। ওদের মত স্টেপিং ফেলে দৌড়তে। হঠাৎ সে উঠে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করল। যেভাবে ওরা পা ফেলছিল সেই ভঙ্গিতে পা ফেলে ছোট্ট ঘরটায় আনন্দ পাক দিতে শুরু করল।

মাথাটা ঘুরছে, আনি-মানি-জানিনার পর যেভাবে ঘোরে। হাঁফ ধরছে। কারণ, যে-কোন পরিশ্রমই একদম বারণ। আনন্দ দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখটা রাগে গনগনে হয়ে উঠল। দ্বিগুণ জোরে সে হাঁটু তুলে তুলে ঘরের মধ্যে গোল হয়ে ছুটতে শুরু করল। আর বিড়বিড় করে বলতে থাকল:

"বেশ করব। বেশ করব। বারণ বারণ বারণ। মানি না মানি না। এভাবে বেঁচে থাকার দরকার নেই, মানে হয় না।"

বিছানার উপর দড়াম করে পড়ল সে। বালিশে মুখ ডুবিয়ে হাঁফাচ্ছে। হাঁফানিটা ধীরে ধীরে কান্নায় রূপান্তরিত হল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কিছুক্ষণ কেঁদে সে শূন্য চোখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। তখন সে একটা পাখির ডাক শুনতে পেল। প্রথমে ভেবেছিল বাঁশি। দ্বিতীয়বারে সে মুখ তুলে উত্তরের জানলা দিয়ে তাকাল। ক্ল্যারিওনেটে প্রথম ফুঁ দেওয়ার মত করুণ একটানা। সেকেণ্ড চারেক পরই স্বরটা ছটফটিয়ে লাফালাফি করল ছোট্ট বাছুরের মত।

বার তিনেক ডাকার পর পাখিটার আর সাড়া নেই। কী পাখি? কোথায় ছিল এতদিন? ঝোপ-জঙ্গলের দিকে চোখ রাখল আনন্দ। অদ্ভুত ডাকটা তো। ময়না, কোকিল আর টিয়ে, কাক, চড়াই আর পায়রা ছাড়া ক'টা পাখির ডাকই বা শুনেছি। ক'টা গাছই বা চিনি। গ্রামের ছেলেরা অনেক বেশি জানে। এ পাখিটা আগেও হয়তো ডেকেছে, শুনিনি। কী মিষ্টি, অদ্ভুত কী যেন একটা রয়েছে শিসটায়।

আনন্দ বুঝতে পারছে না, কিন্তু শরীরে অনুভব কবতে পারছে। হাতের রোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে। তিরতির করে কাঁপুনি দিয়েছিল যেভাবে আজ সকালে তার বুকের মধ্যে হয়েছিল। নিঃসঙ্গ দিন ও রাতের মধ্যে ঢুকে পড়েছে অজানা এক সঙ্গী, এই শিসটা।

আবার শিস্।

পুবের জানলায় সরে এসে আনন্দ নিম গাছের ডালে-ডালে চোখ ফেলতে লাগল। কত বড়? চড়ুইয়ের মত ছোট্ট? কাকাতুয়ার মত বড়? শালিক পাখির মত রঙ? কী নাম?

আনন্দ একবার উত্তরের, একবার পুবের জানলায় আসা-যাওয়া শুরু করল। আর ডাকছে না, হয়তো উড়ে গেছে। কিংবা ও সারাদিন তিন-চারবারের বেশী ডাকে না। কত পাখির কতরকমের স্বভাবই যে থাকে। কিংবা এখুনি হয়তো কোন বেড়াল কি চিল কি সাপ ওকে···!

হতাশ হয়ে আনন্দ বিছানায় শুয়ে বাইরে তাকাল। আকাশ ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আকাশে মেঘ, উঁচু থেকে তোলা হিমালয় পর্বতমালার ছবির মত। কী নিঃসঙ্গ, ধূ-ধূ, বিবাট! বহুদিন আগে একটা রূপকথায় সে পড়েছিল, মানুষ মারা গেলে মেঘ হয়।

সে বিশ্বাস করতো এবং এখনো করে তার মা মেঘ হয়ে আকাশে কোথাও আছে। কিংবা হয়তো নেই। গনগনে রোদের তাপে সমুদ্র নদী খাল বিলের জল বাষ্প হয়ে মেঘ হয়। এসব প্রকৃতির তৈরী মেঘ। তার মা এভাবে মেঘ হবে না। কিভাবে হবে, কেমন দেখতে হবে তাই নিয়ে সে ভাবতে থাকল।

ঘুমিয়ে পড়েছিল আনন্দ। বন্ধ দরজায় ধাক্কার শব্দে ঘুম ভাঙল। হাবুর মা দুধ এনেছে। সে তাকাল লেবুগাছের পাশ দিয়ে মাঠের দিকে। ম্লান হয়ে এসেছে বিকেল। সন্ধ্যা নামছে। কয়েকটি মেয়ে মাঠের উপর দৌড়ে গেল। তারপর ও এল দুলতে দুলতে। ভাঙা ইঁটের টুকরো কুড়িয়ে একধারে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে এগোচ্ছে। খালি পায়ে মেয়েদের পা কাটে, ব্যথা লাগে বলে তাই কাজে নেমে পড়েছে। সেই কুড়োনোরই কাজ। আনন্দ হাসতে গিয়েও হাসল না। ও যা কিছু করে সবই অন্যকে সাহায্য দিতে যেটা ওরই দরকার। লেডি সোবার্স বিকেলে আসে না। এধার ওধার ঘুরে এই সময়টায় হয়তো লটারির টিকিট বিক্রিতে ব্যস্ত থাকে। নিশ্চয় খুব গরীব। অনেকগুলো লোক আছে বাড়িতে, তাদের খাওয়াতে পরাতে হয়। ওর কাছ থেকে একটা টিকিট কিনলে কেমন হয়?

সন্ধ্যায় হাবুর মা আফিংয়ের মৌতাতে বুঁদ হয়ে থাকে। বাবা চেম্বারে, মেজদা তো কোনদিনই ফেরে না। বিপিনদা এইমাত্র কাচা জামা-প্যান্টের পুঁটলি নিয়ে বেরোল ধোপার কাছে ইস্ত্রি করিয়ে আনতে।

সন্তর্পণে ফটক থেকে বেরিয়েই আনন্দ প্রায় ছুটে অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়ে ইন্‌সটিট্যুটের দিকে এগোল। ডগুদা লাইব্রেরি খুলেছে অনেকক্ষণ।

ডগুদা নিজেই একদিন বলেছিল, তার নাম ডগু কেন।

"ডগ্ থেকে ডগু। ডগ্ মানে কুকুর। পতৌদির নাম টাইগার কেন জানিস? ছোটবেলায় ও বাঘাহামা দিত। তাই আদর করে টাইগার বলে ডাকা হত। আমিও ওই রকম হামা দিতুম, কিন্তু আমাকে বাবা আদর করে বলত ডগ্। পতৌদির বাবা ছিল নবাব, আমার বাবা ছিল স্যাকরার দোকানের কারিগর। জীবনে হালুম-হালুম করার চান্স্ আর এল না, শুধু ঘেউ ঘেউই করে গেলুম। তাই সবাই বলে রগচটা ডগু।"

ডগুদার বয়স বোঝা যায় না। চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে যে কোন একটা বয়স ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিয়ে করেনি। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছে কিনা বোঝা যায় না কথাবার্তায়। মাথায় টাক, ছোটখাট রোগাটে চেহারা। ভাইদের সংসারের এককোণে পড়ে আছে। বাড়ির বাইরের দিকের ঘরটায় থাকে। ময়দানে ঘেরা-মাঠের গেট-কীপার। দৈনিক সাতটাকা মাইনে। বছরে পাঁচমাস মাত্র এই চাকরি। বাকী সাতমাস চলে টিউশ্যনি করে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলেকে পড়িয়ে মাসে আশি টাকা পায়। আর আছে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের জন্য বেগারখাটা। তারই অন্যতম, এই অবৈতনিক লাইব্রেরিয়ানের কাজ।

পঁয়ত্রিশ বছরের এই লাইব্রেরীতে গত বছর দশেক বই কেনা হয়নি। তার আগে কেনা আর চেয়েচিন্তে আনা হাজার খানেক পুরনো বই নিয়েই ডগুদা চালিয়ে যাচ্ছে। মেম্বারদের চাঁদা থেকে মাসে গোটা পঁচিশ টাকা পাওয়া যায়। ইলেকট্রিক বিলের বাকী টাকা জমে গেলে ডগুদা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে সেক্রেটারী অনাদি-প্রসাদের কাছে। কিছুক্ষণ ধরে চড়াগলায় বলে যায়—"পাড়াটা মরে

গেল, এলাকাটা মরে গেল। কী ছিল আর কী হয়েছে! ছেলেরা বই পড়ে না, খেলাধুলো ব্যায়াম করে না। আপনারাও এসব দেখবেন না। নতুন বই কেনা দরকার, খেলার জিনিস-টিনিস কিনে ছেলেদের সংগঠিত (ডগুদা ঘেরামাঠ কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্য) করে একটা খেলার ক্লাব দরকার। প্রেসিডেন্ট তো মাঠটাকে নিজের কায়েমী স্বার্থে ব্যবহার করছে, তার তো উদ্দেশ্য মাঠটায় যাতে খেলাধুলো না হয়। বুঝি না ভেবেছেন? আমি ঠোঁটকাটা মানুষ, যা বুঝি তাই বলেছি। এসব আমি হতে দেব না, আপনি মেম্বারদের ডেকে সভা করুন, আমি বক্তব্য রাখব, আবেদন জানাব।"

কোনবারই সভা ডাকা হয়নি, সুতরাং আবেদনও জানান হয়নি। তবে লাইব্রেরির ইলেকট্রিক বাতি জ্বলা বন্ধ হয়নি। অনাদিপ্রসাদ বিল মিটিয়ে দেন।

ডগুদা মাথা নিচু করে ইস্যু করা বইয়ের নাম খাতায় লিখছে। অপেক্ষমাণ মেম্বারের হাতে বইটা দেবার সময় মুখ তুলেই দেখল আনন্দকে।

"কী রে, তোর নাকি অসুখ? স্কুলে যাওয়া বন্ধ?"

"কে বলল?"

"তোদের ক্লাসের শিবনাথ। হয়েছে কী?"

"বুকে একটা ব্যথা, রেস্ট নিলেই সেরে যাবে।" ইতস্তত করে আনন্দ বলল, "ডগুদা, খেলার বই কিছু আছে আর?"

"আর! মানে? ছিল নাকি কোনকালে যে আর থাকবে?"

আনন্দ চোখ বোলাল ডগুদার পিছনে পর পর দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে থাকা বইয়ের র‍্যাকগুলোর দিকে। ছাদ থেকে শিকে ঝোলান তক্তায় রয়েছে পুরনো বাঁধানো পত্রিকা। মেঝেয় পড়ে আছে

উইয়ে খাওয়া কিছু বই। ওগুলো ওজনদরে বিক্রি হবে।

"একটা বই তো ছিল, ব্র্যাডম্যানের আর্ট অফ ক্রিকেট। উইয়ে খেয়েছে বলে—"

আনন্দ থেমে গেল। বই পালটাতে এসেছে বটতলার মাইতিদের বাড়ির চাকর।

"মা জিজ্ঞাসা করতে বলল, নেতাজীকে নিয়ে কী একটা বই বেরিয়েছে, সেটা দিতে।"

"এখনো কেনা হয়নি।"

"তাহলে নিমাই—"

"ইস্যু হয়ে গেছে।"

"তাহলে মোটা একটা বই দিন। একটা গপ্পো থাকবে।"

ডগুদা মুখ পিছনে ফিরিয়ে কাকে যেন বলল, "একটা মোটা উপন্যাস দে তো রে। তিননম্বর র‍্যাকটা ত্থাখ্।"

ডগুদা এরপর আনন্দকে উদ্দেশ করে বলল, "লাইব্রেরি বলবি এটাকে ? ওই যে বাঁধানো লেখাটা, পড় তো।"

আনন্দ এগিয়ে গেল দরজার পাশে ঝোলানো লেখাটা পড়তে। ধুলো আর বৃষ্টির জলে, বহুবছর আগে তুলি দিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি ঝাপসা হয়ে গেছে।

"এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে··· পড়তে পারছি না ডগুদা, জেবড়ে গেছে···"

"দেবতাত্মা হবে।"

"দেবতাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের··· পড়তে পারছি না।"

"কাগজের হাহাকারে।"

"বাঁধা পড়িয়া আছে।"

"তারপরের প্যারা ?"

"শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি···ধুয়ে গেছে।"

"সমুদ্রের।"

"সমুদ্রের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছ ?"

"এবার বল্ এখানে কী শুনতে, কী দেখতে পাচ্ছিস ? সমুদ্রের শব্দ ? দেবতা আর অমব আলোক ?"

"কথাটা দেবতাত্মা নয়, মানবাত্মা।"

চমকে আনন্দ ঘুরে দাঁড়াল। সামান্য বাদামি ঝাঁকড়া চুল, পাখির ঠোঁটের মত নাকের ডগাটা বাঁকা। হাতে একটা বই। সেই-রকম চুপিসাড়ে র‍্যাকগুলোর পিছন থেকে এসে দাঁড়িয়েছে ডগুদার পাশে।

"কথাটা হচ্ছে—এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মাব অমব আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজেব···হাহাকারে নয় কাবাগাবে, বাঁধা পড়িয়া আছে। শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেবির মধ্যে কি হৃদয়ের···সমুদ্রের নয়, উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছ ?"

আনন্দ অবাক হয়ে তাকিয়ে শুনছিল ওব কণ্ঠস্বব। যেন সরোদ বাজাচ্ছে গলা দিয়ে। ক্ষীণ শ্রদ্ধা জমে উঠল তার মনে। ডগুদা বিব্রত মুখে খাতায় বইয়ের নাম লিখতে লিখতে বলল, "সময় হয়ে গেছে, এবার কিন্তু বন্ধ করব।"

দুলতে দুলতে ও বেরিয়ে গেল। হাতে একটা পাতলা বই। দরজার কাছে গিয়ে একবার ফিরে তাকিয়েছিল আনন্দর দিকে।

চোখাচোখি হতেই হেসেছিল, আনন্দও।

"ও কে ডগুদা ?"

"অমল। ওকে আমি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট লাইব্রেরিয়ান করেছি। ভীষণ পড়ে। দেখলি তো কী রকম ভুলটা ধরিয়ে দিল।"

"অমল, পদবী কী ?"

"গীতার ছেলে, মানে সতাতো ছেলে, ওর স্বামীর আগের পক্ষের। গীতা যখন বিধবা হয়ে ভাইদের কাছে এল তখন ওকেও সঙ্গে আনে। কেউ দেখার নেই, খাওয়াবার নেই। ওকে ফেলে আসতে পারেনি গীতা, বড় ভালো মেয়ে। ভাইরা অবশ্য মোটেই খুশি নয়। অমলকে, গীতাকেও ওরা উৎপাত বলে মনে করে। বেচারার পা-টা, ওইরকমই আজীবন থেকে যাবে।"

"গীতা কে ?"

"দেখিসনি ? সকালে এই মাঠে মেয়েদের ট্রেনিং করায়, নিজেও করে।"

"লেডি সোবার্স!"

"কী বললি ?"

"কিছু নয়। আপনাদের পাড়ায় থাকে ?"

"পাশের বাড়িতে। অ্যাত্তোটুকু থেকে দেখছি গীতাকে। বিয়ের আগে দারুণ অ্যাথলীট ছিল। বেঙ্গল রিপ্রেজেণ্ট করেছে ন্যাশনাল গেমসে। এশিয়ান গেমসের জন্য ট্রায়াল ক্যাম্পেও একবার গেছল। বিয়ে হল, তারপর বাঙালী-ঘরে যা হয়, বৌয়ের অ্যাথলেটিকস চালিয়ে যাওয়াতে শ্বশুর-বাড়ি রাজি হল না। স্বামী অ্যাকসিডেণ্টে মারা যেতে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি এসেও বছর খানেক প্রায় কিছু করেনি। হঠাৎ মাঠে কানে এল, স্টেট ব্যাঙ্ক নাকি অ্যাথলীট রিক্রুট করবে।

তাই ওকে বললুম, প্র্যাকটিস শুরু কর, চাকরি হয়ে যেতে পারে। টো-টো করে লটারির টিকিট বেচে কদ্দিন চালাবি। চিরকাল তো ভাইয়েরা বসিয়ে রেখে খাওয়াবে না, আর অন্যের হাততোলা হয়ে থাকতে হলে দাসীবাঁদির মত থাকতে হবে। তার থেকে বরং বয়স থাকতে থাকতে যদি কাজটাজ যোগাড় করে নিতে পারে, লেখাপড়াও শেখেনি তেমন, স্কুল-ফাইনাল ফেল। দৌড়ের বয়স পেরিয়ে গেছে, আর হবে না, তবে গায়ের জোরের ব্যাপারগুলো তো হতে পারে। তাছাড়া, পাড়ার বাচ্চা-বাচ্চা মেয়েগুলোকে নিয়ে যদি ওকে দিয়ে একটা ক্লাব হয়। ইচ্ছে আছে ভলি আর কবাডিও শুরু করব।”

কথা বলতে বলতে টেবিল গুছিয়ে, জানলা বন্ধ করে ডগুদা আলোর সুইচের দিকে হাত বাড়াল।

আনন্দ বেরিয়ে এসে বাড়ির দিকে হাঁটছে। ইতিমধ্যে কেউ তার খোঁজ করলে, তুমুল কাণ্ডের মুখে পড়তে হবে। একটু জোরেই সে পা চালাল।

“আনন্দ শোনো।”

ফটক ঘেঁষে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। আনন্দ প্রথমে ভয় পেয়ে গেছল আচমকা ডাক শুনে।

“কী বলল ডগুদা আমার সম্পর্কে?”

“তোমার সম্পর্কে কোন কথা তো হয়নি।”

“হয়েছে, আমি জানি। সবাই কৌতূহলী হয়। আমার পা, আমার হাঁটা দেখে হয়। তুমিও হয়েছ।”

আনন্দ চুপ করে রইল। বাড়ির মধ্য থেকে হাঁকডাক আসছে না। বিপিনদা এখনো হয়তো ফেরেনি।

“না, ওসবে আমার কৌতূহল নেই। তবে যতবারই দেখেছি, তুমি

একটা না একটা কিছু দিচ্ছ—হয় বল ফিরিয়ে দিচ্ছ, মাঠ থেকে ইট তুলে ফেলে দিচ্ছ, বই এনে দিচ্ছ, কেন ?"

"ভাল লাগে।"

"ব্যস, এই !"

"হ্যাঁ। আমার পক্ষে এর বেশী কিছু করা কি সম্ভব ?"

"কেন, সেদিন যে বললে, খেলি ! কী খেল, কোথায় খেল ? এস না আমার ঘরে, গল্প করব। একতলার একদম পিছন দিকে নিরিবিলি ঘরটা।"

আনন্দ হাত ধরল অমলের। আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিল ও।

"আমি কারুর বাড়ি যাই না।"

"এলে কিন্তু ভাল লাগত। দিনরাত একা একটা ঘরে বন্দীর মত বাস করছি। হার্টের অসুখ, আমার হাঁটা পর্যন্ত বারণ। এখন লুকিয়ে বেরিয়েছি, জানতে পারলে ভীষণ বকুনি খেতে হবে।"

"কে বকবে, মা ?"

আনন্দ হেসে উঠল।

"মা নেই।"

ওহ্। আমারও নিজের মা নেই। তার জন্য আমার অবশ্য কোন দুঃখ নেই। এই মা আমাকে ছোট থেকে নিজের ছেলের মত ভাল-বেসেছে। আমার জন্য আজও কষ্ট করছে।"

"শুনলুম ডগুদার কাছে।"

"তাহলে আমাকে নিয়ে কথা হয়েছে।"

"শুধু এইটুকুই।"

"আমার খুব অস্বস্তি হয় যখন কেউ আড়ালে আমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করে। কেন যে হয় জানি না। লোকে আমাকে দেখে

আড়ালে হাসে। একা থাকতেই ভালবাসি ”

“আর আমি সঙ্গ পাবার জন্য ছটফট করছি।”

“দুজনের ব্যাপারটা দুরকম। আমার চেহারা, এই খোঁড়া পা, আর তোমার হার্ট। তুমি বল করবো, আর আমি কুড়োই।”

“আমার খেলা চিরতরে বারণ হয়ে গেছে। আমার যা অসুখ তা সরে ওঠার নয়। কিন্তু তুমি তো খেলো। কী খেলা বললে না তো।”

উত্তর শোনার আগেই আনন্দ দেখল বীরা দত্ত রোড থেকে বিপিনদা মাঠের দিকে এগোচ্ছে। হাতে ইস্ত্রি-করানো কাপড়ের পাঁজা।

“আমি পালাই।”

আনন্দ ছুটে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

গভীর রাতে একবার তার ঘুম ভেঙেছিল। তখন হঠাৎ আপনা থেকেই তার মনে হয়, পাখিটা এইবার হয়তো ডাকবে। সে অপেক্ষা করে। দোতলা থেকে ক্ষীণভাবে সেতারে আলাপের শব্দ আসছে। মেজদা টেপ-রেকর্ডার চালাচ্ছে। নিখিল ব্যানার্জির বেহাগ। বড়দা কানাডা থেকে পাঠিয়েছে রেকর্ডারটা। নিজের নিঃশ্বাস ছাড়া আনন্দ আর কিছু এখন শুনতে চায় না। হৃদপিণ্ডটা ধকধক করে যাচ্ছে আর ক্রমশ একটা ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। এই ধকধকানিটা বন্ধ হয়ে গেলেই সে মরে যাবে। ওটা বন্ধ হবার নোটিশ জারী হয়ে গেছে। কেউ না বললেও সে সকলের হাবভাব থেকে বুঝতে পারছে, গুরুতর কিছু একটা হয়েছে। এই শব্দটা সচল রাখার জন্য তাকে সাবধানে, কম নড়াচড়া করে বন্দী জীবন কাটাতে হচ্ছে। কী দারুন, ভয়ঙ্কর আর মিষ্টি এই হার্টের শব্দ। প্রাণভরে এমন করে সে আগে

কখনো শোনেনি। মেঝেয় শোয়া হাবুর মার নাকডাকার শব্দ শুনতে শুনতে তারপর কখন যেন সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে জানলা থেকেই আনন্দ দেখল মেয়েদের দৌড় শেখা। ওদের সঙ্গে হাফপ্যাণ্ট পরে লেডি সোবার্সও দৌড়চ্ছে। শট ছোঁড়া দেখতে পেল না। সেজন্য বাইরের রকে যাওয়া দরকার।

অরুণ প্রতিদিনের মত দেখতে এল আনন্দকে।

"মেজদা, আর এভাবে থাকতে পারব না। আমি ভাল হয়ে গেছি।"

"কী করে বুঝলি?"

"কেন, এই তো দিব্যি চলাফেরা করছি, বুকে কোন কষ্ট হচ্ছে না।"

"দিব্যি আছিস বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। ঘোরাঘুরি করলে দিব্যি থাকতিস না। আচ্ছা, দিনে একবার ফটকের কাছে যাবার পারমিশান দিলাম।"

আনন্দর সন্দেহ হল এত সহজে চট্ করে মেজদার উদার হয়ে যাওয়ায়। ডাক্তারবাবু নিশ্চয় আরো বেশী অনুমতি দিয়েছে, অনেক আগেই। মেজদা সাবধান হবার জন্য চেপে রেখেছিল, এখন টিপে টিপে ছাড়ছে।

"ফটক নয়, লাইব্রেরি পর্যন্ত, আর একবার মন্দিরেও।"

"ওরে বাবা, মন্দির! রাস্তা পার হওয়া চলবে না। গাড়ি এসে পড়লেই তো ছুটবি। না, না, শুধু লাইব্রেরি পর্যন্ত!"

"দিনে দুবার, সকালে আর বিকেলে।"

"উঁহু, একবার।"

"তাহলে, ঘরে কিন্তু স্কিপিং শুরু করব।"

আনন্দ মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছে না। এটা অরুণ বুঝতে পারল ওর চোখের দিকে তাকিয়ে। অনুমতি দিয়ে ঘর থেকে বেরোচ্ছে, আনন্দ ডাকল। "তোমার টেপরেকর্ডারটা আমাকে দাও না, দেবে ?"

"কী করবি ? ট্র্যানজিস্টার তো রয়েছে।"

"ভাল লাগে না রেডিও। আমি তোমার টেপগুলো চাই না, শুধু রেকর্ডার আর নতুন একটা ক্যাসেট। টেপ করব আমি।"

"নিজের গান ?"

"গান কি জানি। যখন যা আমার মনে আসবে বলব, অন্যের কথা, হাবুর মা—বিপিনদার ঝগড়া, ডগুদার গলা, গাছের পাতার শব্দ আর একটা পাখির ডাক। খুব মিষ্টি সুন্দর ডাক।"

"নষ্ট করবি না, ভাঙবি না ?"

আনন্দ জোরে মাথা নাড়ল।

"আচ্ছা, কাল কি পরশু টেপ কিনে এনে দেব।"

বিকেলে শিবা দত্তর কারখানার দুটি লরি মাঠের প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাল খালাস করছে। মাঠের উপর লোহার চাদর স্তূপ করে রেখে একটা লরি চলে গেল। মেয়েরা দৌড়তে এসেছে। অপেক্ষা করে করে ওরা চলে যাচ্ছিল। আনন্দ রক থেকে লক্ষ্য করছিল, এবার এগিয়ে এল।

"তোমরা চলে যাচ্ছ কেন, দাঁড়াও।"

মেয়েরা দাঁড়িয়ে গেল। আনন্দ লরি সরিয়ে নেবার জন্য ড্রাইভারকে বলল। কর্ণপাত করল না লোকটি।

"এটা কারখানার জমি নয়, খেলার মাঠ। এ-জমির মালিক বট-তলা ইন্‌সটিটিউট।"

"হবে।" ড্রাইভার নিরাসক্ত স্বরে বলল।

রেগে উঠল আনন্দ। প্রায় চিৎকার করে সে বলল, "লরি হটাও।"

লোকটি বিড়ি ধরাল। জবাব দিল না।

"এটা খেলার জায়গা, লরি হটাও এখান থেকে।"

রাগে হাত কাঁপছে, সেই সঙ্গে আনন্দ অনুভব করল, বুকের মধ্যে অস্বস্তিকর একটা কিছু জমছে। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, উত্তেজনা আসতে পারে এমন কোন ব্যাপারে যাবে না, চিন্তাও করবে না। উচিত হয়নি, এ-ভাবে রেগে যাওয়ার মত ব্যাপারে নাক গলানো ঠিক হয়নি। কিন্তু সরে আসি কী করে। মেয়েরা যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"আমাকে বলে কী হবে, ম্যানেজারবাবুকে বলোগে যাও।"

লোকটা বিড়িতে টান দিয়ে কারখানার গেটে দয়ানিধির দোকানের দিকে চলে গেল। আনন্দ ভেবে পেল না এইবার তার কী করা উচিত। মেয়েরা কোন কথা না বলে চলে যাচ্ছে। অসহায়ের মত সে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ চিৎকার করে বলল, "টায়ার ফাঁসিয়ে দোব। লরি কী করে চলে দেখব।"

মাল-খালাস-করা মজুররা কৌতূহলভরে তার দিকে তাকাল। দপ দপ করে উঠল আনন্দর রগটা। কিছু করার নেই তার। লরিটাকে টান মেরে লোহাগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে। মেয়ে ক'টি জেনে গেল, সে একটা অপদার্থ, হামবাগ। ডগুদাকে বলতে হবে, শিবা দত্ত নাকি কথা দিয়েছিল বিকেলে লরি ঢুকবে না, মাঠেও মাল রাখা হবে না। কী হল সে কথার?

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে আনন্দ ফিরে এল। অনেকদিন পর আবার বুকে সেই ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। নিজের ঘরে এসে সে শুয়ে পড়ল।

আর তখনই জলার দিক থেকে ভেসে এল মিষ্টি শিস্‌। তাড়াতাড়ি উঠে বসতে গিয়েই সে বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা দেওয়া যন্ত্রণায় অসাড় হয়ে চাপা আর্তনাদ করল। পলকের জন্য তার মনে হল, এইবার সে মারা যাবে। টপটপ করে চোখ থেকে জল পড়তে শুরু করল তার। সে ভাবল, আমি আর কখনো সেরে উঠব না। এই ঘরটায় চিরজীবন একা পড়ে থাকব। ভগবান, কেন আমায় অন্য কোন অসুখ দিলে না ?

গভীর রাত্রে বৃষ্টি নামল। হাবুর মা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। হাত বাড়িয়ে উত্তরের জানলাটা বন্ধ করতে পারে আনন্দ। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাসি হবে। ডাক্তারবাবুব বারণ, বলেছিলেন ব্রংকাইটিস যেন না হয়। তাহলে কিন্তু আর কখনো সারবে না।

জানলাটা বন্ধ করার জন্য আনন্দ হাত বাড়াল। তখনি তার মনে হল শিস্‌টা যেন আবার ভেসে এল। বৃষ্টির ছাট মুখে লাগছে। গলা-বুক ভিজে গেছে। একটা অস্ফুট স্বর তার বুকের মধ্যে বলছে, 'আন্দ, আন্দ, লক্ষ্মী হয়ে থ্যাকিস।'

হাতটা টেনে নিয়ে আনন্দ ফিস ফিস করে অভিমানী গলায় বলল, "থাকব না।"

"আমার আনন্দ খুব লক্ষ্মী, খুব ভাল ছেলে।"

"আমি ভাল ছেলে হতে চাই না। আমি বেরোতে চাই, খেলতে চাই, এই ঘর থেকে মুক্তি চাই।"

"না আনন্দ, মেজদা যা চায় তাই করিস। তোর ভালর জন্যই ও শক্ত হয়েছে।"

"আমি একা থাকতে পারছি না। এ ভাবে একা থাকলে আমি মরে যাব। তুমি এসে থাকো না আমার সঙ্গে ?"

“আমার আনন্দটা একদম পাগল, থাকবো কি করে, আমি যে মরে গেছি।”

“আমিও মরে তোমার কাছে যাব।”

“না আন্দ, না। তোর কথা শুনে আমার কষ্ট হচ্ছে। তোর দুঃখ দেখে আমার চোখে জল আসছে।”

হাতের উপর বৃষ্টির ফোঁটা। আনন্দ চাটতে শুরু করল। মায়ের চোখের জল। মা মেঘ হয়েছে দুঃখটা যখন বাষ্পে রূপান্তরিত হল। আনন্দ বৃষ্টির ছাটের দিকে মাথাটা এগিয়ে আনল।

॥ ছয় ॥

সকালে চোখ খুলেই আনন্দ বুঝল তার গা-গরম, চোখ জ্বালা করছে, মাথা-ভার। জ্বর আসবে নয়, এসে গেছে। বিছানা থেকে নামল। জানলা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। দৌড় শেষ করে মেয়েরা বোধহয় চলে গেছে। লেডি সোবার্স হয়তো এখনো প্র্যাকটিস করে চলেছে। হাবুর মার গলার স্বর আসছে রান্না ঘর থেকে। মেজদার নিশ্চয় ঘুম ভাঙেনি। বাবা এতক্ষণে সেরেস্তায় বসে পড়েছে। আনন্দর মনে হল এখুনি কাল বিকেলের কথাটা ডগুদাকে বলতে হবে।

ব্লাউজের মত জামা আর হাফ প্যাণ্ট পরে কোমরে হাত দিয়ে গীতা হাঁফাচ্ছে। সকালের রোদে চিকচিক করছে ঘামে ভেজা শরীর। জমিতে আঁচড় কেটেই অমল চেঁচিয়ে উঠল।

"এক বিঘৎ বেশি!"

গীতা হাসল। চোখে অবিশ্বাস।

"সত্যি বলছি, তুমি এসে দেখে যাও।"

এগিয়ে এসে গীতা ঝুঁকে দেখল। অবিশ্বাস বদলে হল বিস্ময়।

"তুমি তো আমায় বিশ্বাসই করো না।"

"কেন করব? কাল তুই তো কমিয়ে দাগ কেটেছিলি। এক বিঘৎ না আর-কিছু, ইঞ্চি চারেক হবে।"

"আমার বিঘতের মাপে বলেছি।"

অমল হাসতে হাসতে কাছে এসে দাঁড়ান আনন্দকে বলল, "মায়ের আঙুলগুলো কত লম্বা দেখেছ?"

গীতার হাতটা সে তুলে ধরল আনন্দর দিকে। ছাড়িয়ে নিয়ে গীতা লোহার শটটা কুড়িয়ে সার্কলে ফিরে গেল।

"কাল বিকেলে তুমি চেঁচামেচি করেছিলে লরি দাঁড়ানোর জন্য?"

মাথা নেড়ে আনন্দ তাকাল লাইব্রেরির দিকে। দরজা বন্ধ।

"ডগুদা আজ সকালে শুনেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছে শিবা দত্তর বাড়িতে যাবার জন্য। আমাকে দেখতে বলে গেছে লাইব্রেরি। দারুণ রেগেছে।"

একটি লোক বই হাতে আসছে। দেখেই অমল তার নিজস্ব ভঙ্গিতে ছুটল লাইব্রেরির দিকে।

লেডি সোবার্স শট গালে ঠেকিয়ে কুঁজো হয়ে তৈরী। আনন্দ পিছিয়ে এল। মাথাটা আরও ভার লাগছে। শরীরটা দুর্বল, কনুই আর হাঁটুতে ব্যথা। অন্তত একশো জ্বর।

"আ আ আহ্...অঁক্।"

ধপ্ শব্দ করে লোহার গোলাটা ভিজে মাটিতে বসে গেল। আনন্দ আপনা থেকেই দু-তিন পা এগিয়ে থেমে পড়ল। হাতে করে গোলাটা ওর কাছে পৌঁছে দেবে কিনা ইতস্তত করে ভাবছে। ততক্ষণে গীতা এগিয়ে এল। ভ্রূ কুঁচকে মাটির দিকে ঝুঁকে ইটের টুকরোটা দিয়ে দাগ কেটে, গোলাটা তুলে নিয়ে ফিরে গেল। আনন্দকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনল না। আনন্দ কেমন যেন অপ্রতিভ বোধ করল।

আবার গোলাটা পড়ল। ইটে সাজানো সার্কলের কিনারে দেহের টলমলে ভারসাম্য সোজা করে রাখতে রাখতে গীতা তীক্ষ্ণচোখে

তাকাল যেখানে গোলাটা পড়েছে। আনন্দ হাত তুলে ওকে অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করল।

এগিয়ে এসে গোলাটা তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দর মনে হল, এখান থেকে সার্কলটা মাত্র পনেরো-ষোলো হাত তো দূরত্ব! বোলার অ্যাণ্ডি কি হাতে করে পৌঁছে দিয়ে আসবে? একজন মেয়ে যদি ছুঁড়তে পারে এতটা তাহলে আমিই বা পারব না কেন, অমল কি সবাই? ভারী জিনিষ তোলা বারণ, কিন্তু একবার তুললে এমন কি আর হবে! কিছু হয় কিনা দেখাই যাক না।

ডান গালের কাছে গোলাটা ধরে আনন্দ ঠিক গীতার নকল করে কুঁজো হল। কনুইয়ে যন্ত্রণা, কবজি বেঁকে যাচ্ছে। গীতার মুখে হাসি খেলে গেল, তাই দেখে আনন্দর মুখেও হাসি ফুটল, শরীরে কি রকম একটা রোখ ঝাঁঝিয়ে উঠল। শরীরটা দোলাতে দোলাতে হাঁ করে নিশ্বাস নিয়ে ডান পায়ে ভর দিয়ে গীতার মত ছোট ছোট দ্রুত লাফে গোলাটা ছোঁড়ার জন্য একধাপ লাফিয়েই হঠাৎ তার মনে হল সে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। চাপা চিৎকার করে সে পড়ে গেল মাটিতে। গোলাটা পড়ল তার ডান পায়ের পাতা ঘেঁষে।

যখন সম্বিৎ ফিরল, আনন্দর মনে হল, সে যেন ঢেউয়ের উপর ভাসছে। চোখ খুলেই লজ্জায় চোখ বন্ধ করল। লেডি সোবার্স তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলেছে বাড়ির দিকে। পাশে হাঁটছে অমল।

"আমায় নামিয়ে দিন, এভাবে আমায় নিয়ে যাবেন না বাড়িতে।"

আনন্দর করুণ ক্ষীণ স্বর অগ্রাহ্য করেই ওরা ফটকের কাছে পৌঁছল।

"আর যাবেন না, নামিয়ে দিন এখানে।"

ওকে নামিয়ে দিল গীতা। এইরকম পোশাকে অচেনা বাড়িতে যেতে তারও সঙ্কোচবোধ হচ্ছে।

"পারবে হেঁটে যেতে? আর কখনো কিন্তু এমন কাণ্ড করবে না, অল্পের জন্য পা-টা বেঁচে গেছে। অমল, তুই ওকে ভিতরে পৌঁছে দিয়ে আয়। গা-টা বেশ গরম লাগছিল। বোধহয় জ্বর হয়েছে।"

গীতা তালুটা আনন্দর কপালে রাখল। তাড়াতাড়ি আনন্দ ফটক পেরিয়ে বাড়ির দিকে এগোল। হাঁটু কাঁপছে, হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

"তুমি আমার কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে চলো। মা জানে না তোমার হার্টের অসুখ।"

পিছন থেকে এগিয়ে এল অমল। আনন্দর ডান হাতটা ধরে নিজের কাঁধে রেখে বলল, "চলো।"

আনন্দ ভয় পেল। অবশেষে এক বিকলাঙ্গের উপর ভর করতে হচ্ছে! অসম্ভব একটা রাগে ঝাঁঝরা হতে হতে অমলের কাঁধে চাপ দিয়ে বলল, "আমার মরে যাওয়া উচিত, যাবও।"

"কেন?"

আনন্দ জবাব দিল না।

"রাগ করছ কেন? মানুষ মানুষের সাহায্য কি নেয় না বিপদে পড়লে? এতে লজ্জার কি আছে?"

"সে তুমি বুঝবে না।"

অমল হাসল। হাসিটা ম্লান দুঃখভরা। আনন্দ ইতস্তত করে বলল, "তোমাকে সাহায্য নিয়ে চলতে হয়—"

"নিশ্চয়। তাইতো আমি ভাল করে জানি মানুষের কাছে মানুষ কত দরকারী।"

"কিন্তু আমারও মানুষকে দরকার। একা একা হাঁফিয়ে গেছি।"

"ঠিক আছে, মাঝে মাঝে আসব।"

বিপিনদার গলার শব্দ এগিয়ে আসছে। আনন্দ ভিতরে ঢুকে গেল।

"আজ কেমন আছ?"

আনন্দ বিছানার উপর গড়িয়ে জানলার ধারে সরে এসে মাথা হেলিয়ে হাসল, "ভালো।"

উত্তরের জানলার শিক ধরে অমল কনুই দুটো জানলার পাটায় রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল।

"কী করছিলে?"

আনন্দ টেপরেকর্ডারটা দেখাল।

"ভীষণ মজার জিনিস। কাল বিকেলে ডগুদার মাঠের ঝগড়া ঘর থেকে যা শুনতে পাচ্ছিলাম, টেপ করেছি।"

আনন্দ 'প্লে' লেখা বোতামটা টিপল। প্রথমে খবখর শব্দ হয়ে দূরে মোটরগাড়ি চলার, উঠোনে বাসনের, দোতলায় বিপিনদার গলার, ট্রেনের ভেঁপুর আওয়াজের মধ্য দিয়ে প্রকট হতে লাগল ডগুদার সঙ্গে কারখানার ম্যানেজারের ঝগড়া।

"আমি বলছি সরাতে হবে···জানতেই পারবেন কে আমি।··· আমি একজন পাবলিক, আমার বলার অধিকার আছে।"

"যান্ যান্ মশাই, পারেন তো কোর্টে গিয়ে প্রমাণ করুন যে এ-জমি ইনসটিটিউটের।"

"কোর্ট-ফোর্ট কী দেখাচ্ছেন, রীতিমত লেখাপড়া করে দান-করা জমি। সবাই জানে···"

"দলিল আছে?"

"আলবাৎ আছে। সেক্রেটারী অনাদিবাবুর কাছে আছে।"

"মালিককে গিয়ে ওসব কথা···"

"সে-ব্যাটার দেখা পেলে তো···"

"মুখ সামলে···লরি রোজ দাঁড়াবে···অ্যাই দরোয়ান, ড্রাইভারকে বলবে এখানে···"

"তুলে দোব কারখানা, আগুন জ্বালিয়ে দোব। এটা খেলার মাঠ, শিবা দত্তর কারখানার জমি নয়। দরকার হলে কোর্টেই যাব। অ্যাজিটেশন করব, আন্দোলন হবে।"

আনন্দ বোতাম টিপে বন্ধ করে দিল।

"ডগুদার ফেভারিট হবি আন্দোলন করা।" দুজনেই হাসল।

"প্রত্যেক মানুষেরই একটা না একটা হবি থাকেই। দেবুদার হল ডিটেকটিভ মেইগ্রে, তোমার কোন হবি আছে ?"

"না।"

অমল মুখ ফিরিয়ে রাখল অন্যমনস্কের মত। আনন্দ মুখ নামিয়ে টেপরেকর্ডারে হাত বুলোতে লাগল।

"মা আর প্র্যাকটিস করতে আসবে না। এখানকার অনেকেই পছন্দ করছে না ওর হাফপ্যান্ট—"

"আমার বাবা ?"

"তাছাড়া কারখানার তিনচারটে লোক রাস্তায় কাল টিপ্পুনি কেটেছিল। বোধহয় ম্যানেজার কি মালিক পিছনে লাগতে বলে দিয়েছে। মা একজনকে চড় কষায়, আর একজনের কলার ধরে ঝাঁকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ওরা শাসিয়েছে।"

"ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে !"

"হ্যাঁ। পারবে না কেন, মা-তো রোজ রাত্রে ঘরে ওয়েট-ট্রেনিং

করে। ওজন তোলে, ওজন টানে, বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর।"

"ওজন ?"

"লোহা। ইনসটিটিউটে বারবেল, ডাম্বেল, পুলি পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল। ডগুদা সেগুলো দিয়েছে। দিনের বেলায় কাজকর্ম ফেলে একসারসাইজ করতে দেখলে বাড়িতে রাগারাগি করবে তাই রাতে করে।"

"অদ্ভুত তো!"

"কেন? এই কি পৃথিবীতে প্রথম নাকি! মা প্রথমে রাজি হয়নি, বলেছিল এই বয়সে এসব কবে তার কিছু হবে না। আমি বলেছিলুম হবে, আগে তো দৌড়ঝাঁপ করতে, আবাব তুমি শুরু কবো। তারপর শুনিয়েছিলাম রোমানিয়ার লিয়া মানোলিউয়েব্ন কথা। মেকসিকো ওলিম্পিকে মেয়েদের ডিসকাস-এ সোনা জিতেছিল।"

"তুমি অনেক পড়েছ, অনেক খবর রাখো।"

"সামান্য সামান্য। কাগজে যা বেরোয় তাই একটু আধটু জানি। তা মানোলিউয়েব কথাটা শোনো, খুব ইন্টারেস্টিং। ওকে ট্রেনিং ক্যাম্পে আসতেই বারণ করেছিল ওদের ফেডারেশন, বয়স হয়ে যাওয়ার জন্য। বলেছিল, তোমার দ্বারা আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং মিছিমিছি কেন আর ট্রেনিংয়ে আসা। এর ন' মাস পরেই সে সোনা জেতে মেকসিকোয়। তখন বয়স কত জান? সাঁইত্রিশ! আমার মা-র বয়সও তাই। মাকে তো আর ওলিম্পিক সোনা জিততে হবে না, পেতে হবে একটা চাকরি। ঘরের মধ্যে রাতের পর রাত মানোলিউ ওজন তুলেছে, তিন ঘণ্টা করে। সবাইকে ভুল প্রতিপন্ন করবেই করবে। ইচ্ছা থাকলে মানুষ কী না পারে? স্বামী, সন্তান সব ঘুমোচ্ছে, আর সে একা ট্রেনিং করে গেছে, সঙ্গী

শুধু রেডিওটা, আর বিড়বিড় করে কবিতা আবৃত্তি করেছে যাতে শরীরের কষ্ট ভুলে থাকতে পারে। দৃশ্যটা ভাবতে পার আনন্দ? কী ভয়ঙ্কর কষ্ট স্বীকার করে সোনা পেয়েছে! কী তেজ, কী রোখ্!"

"তুমি ভাবতে পার এমন দৃশ্য?"

একটুও ইতস্তত না করে অমল বলল, "পারি। মানুষ যখন বার বার হেরে যায় তখন হাল ছেড়ে ভেঙে পড়ে। কিন্তু অনেকে পড়ে না। তারাই শেষ পর্যন্ত জেতে। মানোলিউ হেলসিঙ্কি থেকেই ওলিম্পিকে নামছে। সেখানে সিকসথ্, মেলবোর্নে নাইনথ, রোমে ব্রোঞ্জ, টোকিওতে ব্রোঞ্জ। চারবার চেষ্টা করেছে, সোনা পায়নি, তবু সে ভেঙে পড়েনি। ১৬ বছর পর মেকসিকোয় যখন ফাইনালে ছুঁড়তে এল, তখন ডান হাতে চোট্। ডাক্তার ইনজেকশান দিয়ে বলেছে, একবার ছোঁড়ার পরই কিন্তু হাতের জোর কমে যাবে। শুধু একবারই জোরে ছুঁড়তে পারবে।"

অমলের চোখদুটো স্থিরভাবে তাকিয়ে রয়েছে। আনন্দ বিছানায় উঠে বসল। চোখদুটো তাকে যেন চুম্বকের মত টেনে নিচ্ছে।

"জিতলো তো?"

"নিশ্চয়, প্রথমবারেই যা ছুঁড়েছিল তাতেই। কিন্তু তখন তার মনের অবস্থাটা কল্পনা করতে পার?"

"আমি কখনো এরকম অবস্থায় পড়িনি।"

"কল্পনা করো, একটা এইরকম অবস্থা তৈরী করো মনে মনে। ভাবো, তুমি জীবনের শেষ সুযোগের সামনে দাঁড়িয়েছ। সারা জীবন ধরে যে স্বপ্ন দেখেছ তা পূর্ণ হবে কি হবে না, সেটা তুমিই এই মুহূর্তে একমাত্র জানো। এইটাই শেষ, আর সুযোগ কখনো আসবে না

তোমার কাছে। কল্পনা করো।"

"তুমি করতে পার?"

অমল মাথা হেলাল।

"আমি ওলিম্পিকে একশো, দুশো, চারশো মিটারের সোনা জিতি।"

আনন্দ হেসে ফেলল।

"দেবুদা যেমন দারুণ জটিল খুনের মামলার আসামীকে নির্দোষ প্রমাণ করে জেতার স্বপ্ন দেখে!"

"হ্যাঁ। সবাই স্বপ্ন দেখে, ঘুমিয়ে নয় জেগে। আমার মত সব মানুষের ভিতরেই কোন না কোন অঙ্গ পোলিওয় পঙ্গু হয়ে আছে মনে হয়। তাই আস্ত গোটা হবার জন্য স্বপ্ন দেখে।"

"যাঃ কি বাজে কথা বলছ।"

"আমার যা মনে হয় তাই বললুম। সব মানুষই জিততে চায় কিন্তু পারে না এই পোলিওর জন্য। তুমি নিখুঁত মানুষ দেখেছ?

আনন্দ একটু ভেবে মাথা নাড়ল।

"নিখুঁত হওয়া আর জেতা একই ব্যাপার। আসলে সবাই নিখুঁত হতে চায়।"

"তাহলে স্বপ্ন দেখে কি হবে?"

"ওই ভাবেই ইচ্ছাটা পূরণ করে। স্বপ্নে তুমি যা খুশি হতে পার। স্বপ্ন দেখে তারাই যাদের মন আছে, ইচ্ছে আছে। দুর্বল লোকে স্বপ্ন দেখতে পারে না, আমার অনেক ইচ্ছে আছে, জানি সেগুলো পূরণ হওয়া সম্ভব নয় তাই স্বপ্নে পূরণ করি, সেখানে আর একটা পৃথিবী আর এক অমল, সে সব জেতে—সব সব। ইচ্ছে করলে হারতেও পারি, এত ক্ষমতা আমার। নিজেকে বিরাট মনে হয় সেই পৃথিবীতে, তাই

সারাক্ষণ সেখানেই থাকি।"

"সারাক্ষণ স্বপ্ন দেখ!"

"চমৎকার সময় কাটে। একটা পাঁচ বছরের বাচ্চাকেও আমি দৌড়ে হারাতে পারব না। কিন্তু আমি সাড়ে ন' সেকেণ্ডে ওয়ার্লড রেকর্ড করে বোরজভকে হারিয়েছি মিউনিখে। বিকিলাকে হারিয়েছি ম্যারাথনে।"

"আকি-বুয়াকে?"

"চেষ্টা করিনি।"

"মার্ক স্পিজকে?"

"সাঁতার ভাল লাগে না।"

"কী ভাল লাগে তোমার?"

অমল কাঁধে গাল ঘষল। ওর চোখে আর চুম্বক নেই। একপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্টটা চোখে ধরা পড়ছে। আনন্দ ভাবল ওকে বলে ভিতরে এসে বিছানায় তুমি শোও। কিন্তু ও আসবে না। প্রথমদিন ভিতরে আসতে বলেছিল, তখন বলে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ থাকলেই নাকি ওর মাথাব মধ্যে কেমন করে। সব কিছু মনে হয় তাব পায়ের মত সরু দোমড়ানো এমন কি মানুষের মুখ চোখও ভাঙ্গাচোরা বাঁকানো মনে হয়। তাই বাড়ির বাইবেই সারাক্ষণ কাটায়। আনন্দর কাছে এটা অদ্ভুত লেগেছিল। সে চেষ্টা করেও মানুষকে সরু বা দোমড়ানো চেহারা করতে পারে না। এজন্য মনের মধ্যে তাহলে দয়ানিধির দোকানের অদ্ভুত আয়নাটার মত একটা আয়না দরকার যেখানে তাকালেই মুখটা লম্বা চ্যাপ্টা তোবড়ানো দেখাবে।

"কাল রাতে আমি ডাক্তার হয়েছিলাম। বিরাট কেউ নয় খুব

অখ্যাত সার্জন। কেউ সাহস পাচ্ছে না…একটা হার্টবদল করার অপারেশন, পি জি হাসপাতালে। আমি গিয়ে বললাম, আমি করে দেব। ওরা বিশ্বাসই করতে চাইছিল না। যাই হোক শেষকালে রাজি হল, কেননা…"

"কেননা, ছেলেটা এমনিই তো মারা যাবে।"

"ছেলেটা! কে বলল?"

"আমি জানি। তারপর?"

"আটঘণ্টা ধরে করলাম।"

"সাকসেসফুল?"

"নিশ্চয়। এখন আবার সে নেটে প্র্যাকটিস শুরু করেছে। আমি দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, সে কাছে এসে বলল…"

"জানি। সে বলল অমল তোমার জন্য আমিও স্বপ্ন দেখব। তোমার পোলিও সেরে গেছে, তুমি ছুটছ, ভীষণ জোরে ছুটছ, সবাইকে হারিয়ে দিচ্ছ, ট্রফি জিতছ। তোমার জন্য ওলিম্পিকে ভারতের পতাকা উঠছে, জনগণমন সুর বাজছে।"

নীলচে আকাশে যেন সোনালী রোদের আভা ছড়িয়ে পড়েছে। গভীর ঝকঝকে চাহনি আনন্দর মুখের উপর বোলাতে বোলাতে অমল ঠোঁট টিপে মাথা নাড়তে লাগল।

"না না না, তার থেকে বরং তুমি এক কাজ করো, রোজওয়ালকে উইম্বলডন জেতাও। মানোলিউ তবু ১৬ বছর পর জিতেছিল, কিন্তু রোজওয়াল সেই কবে একুশ বছর আগে প্রথম উইম্বলডনে খেলেছে কিন্তু এবারও হেরে গেল। ভাবলে কষ্ট হয় না? বছরের পর বছর চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু আর জিততে পারবে মনে হয় না, বয়স তো হয়েছে। চারবার ফাইনালে উঠে হেরেছে, বুড়ো হয়ে গেছে, আর কবে জিতবে

বলতে পারো ?”

হালকা বিষণ্ণ মেঘে অমলের চোখ ঢেকে গেল। আনন্দ ফিসফিস করে বলল, “জিতবে। কোনর্সকেই হারাবে।”

“বলছ কী? সিক্স-ওয়ান, সিক্স-ওয়ান, সিক্স-ফোর, বিশ্রীভাবে কোনর্স এবার জিতেছে। ওকে হারানো রোজওয়ালের পক্ষে আর সম্ভব ?”

“ইণ্ডিয়ার আনন্দ ওকে হারাবে।” তারপরই নিজেকে শুধরে বলল, “আনন্দ মানে কিন্তু অমৃতরাজ নয়।”

“জানি। এ আনন্দ আমাদের।”

পিছনে শব্দ হতেই আনন্দ ফিরে তাকাল। বিপিনদা বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে।

“দুপুরে তোমার ঘুমোবার কথা, আর তুমি গপ্পো করে যাচ্ছ? ডাক্তারবাবু কী বলে গেলেন সেদিন মনে নেই? কার সঙ্গে গপ্পো করছিলে ?”

আনন্দ জানলার দিকে তাকাল। অমল নেই।

“কার সঙ্গে আবার গল্প করব। টেপ রেকর্ডার চালাচ্ছিলাম তো। শুনবে ?”

আনন্দ বোতাম টিপল টেপ উল্টোদিকে গোটাবার জন্য। থামিয়ে এবার ‘প্লে’ বোতাম টিপল।

“উকিলবাবু, আপনার কাছেই আছে হীরা দত্তর দানপত্রটা। আপনি সেক্রেটারী, আপনার উচিত নয় কি ইনসটিটিউটের স্বার্থ দেখা ?”

আনন্দ তাকাল বিপিনদার দিকে। ডগুদার সঙ্গে অনাদিপ্রসাদের কথার টেপ। চেম্বার থেকে ডগুদার গলার শব্দ পেয়েই রেকর্ডার

চালিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতরের জানলাটার উপর রেখেছিল। বিপিনদা অবাক হয়ে শুনছে।

"দানপত্র আমার কাছে আছে, কে বলল? তাছাড়া জমিটা দানই করে দিয়েছে, এটাই বা তোমার মাথায় এল কী করে? ওটায় খেলতে দিয়েছিল শিবার বাবা, দান করে দেয়নি।"

"বাজে কথা, আপনি ওর উকিল, ওর কাছ থেকে টাকা পান, তাই শিবা দত্তর হয়ে বলছেন।"

"ডগু, ভদ্রভাবে কথা বলো।"

"আমরা সবাই জানি, এ জমির মালিক ইনসটিটিউট। কারখানার সুবিধে হয় বলে জমিটা গাপ্ করতে চাইছে। আপনি তাকে সাহায্য করছেন।"

"তুমি বেরিয়ে যাও, নয়তো ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব, আর মাঠে যদি ওইরকম অসভ্যর মত পোশাকপরা মেয়েছেলে দেখি, তোমাকে—"

"কী আমাকে? মারবেন! কাটবেন।"

"যাতে ভালমত শিক্ষা পাও, সেই ব্যবস্থাই করব।"

আনন্দ বন্ধ করে দিল রেকর্ডার।

"কারোর সঙ্গে গল্প করিনি, এবার বুঝলে?"

"সেইদিন রাতে ডগুবাবু যে ঝামেলা করে গেল, সেই সব কথা! কি আশ্চয্য, অদ্ভুত যন্তোর বার করেছে তো!"

"তোমার কথাবার্তাও এবার যন্তোরে ধরে রাখব যখন হাবুর মার সঙ্গে ঝগড়া করবে।"

"ভয় দেখাচ্ছ?"

আনন্দ জবাব না-দিয়ে পাশ ফিরে শুল। অমলের সঙ্গে কথা

বলার সময় মাঝে মাঝে খেলাচ্ছলে বোতাম টিপে টিপে রেকর্ড করেছে। রেকর্ডার চালিয়ে তাদের দুজনে সেই কথাগুলো শুনতে শুনতে সে জানলার বাইরে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। একসময় তার কানে এল অমলের গলা।

"ভাবো তুমি জীবনের শেষ সুযোগের সামনে দাঁড়িয়েছ। সারা-জীবন ধরে যে স্বপ্ন দেখেছ—"

আনন্দ বন্ধ করে দিল। মনে মনে বলল :

কোনদিনই শেষ সুযোগের সামনে আমার দাঁড়ানো হবে না।··· কিন্তু ইচ্ছা থাকলে মানুষ কী না পারে। সে এই পৃথিবীর মধ্যেই আর একটা পৃথিবী বানিয়ে সেখানে জিততে পারে হারতেও পারে।

॥ সাত ॥

"প্লে।"

প্রায় পনেরো হাজার লোক মুহূর্তে কথা বন্ধ করল। নিশ্বাস নেওয়া ও ছাড়া হচ্ছে চুপিচুপি। উইমবলডন সেণ্টার কোর্টে সেমি-ফাইনাল ম্যাচ—কোনর্সের সঙ্গে ব্যানার্জির।

আনন্দর সার্ভিস।

শান্ত চাহনিতে দেখে নিল, বেসলাইনের মাঝামাঝি কুঁজো হয়ে শিকারী চিতাবাঘের মত জিমি। সার্ভিসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ডাইনে-বাঁয়ে তুলছে। বাঁ হাতে ধরা র‍্যাকেট তীক্ষ্ণ নখের মত। এখনো কানে বাজছে জিমির কথাগুলো। ছোট্ট ড্রেসিংরুমে তারা তুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আয়নায় চুল আঁচড়াচ্ছে। জিমি তার লম্বা চুলগুলো সমান ভাবে কান ঢেকে তুপাশ দিয়ে নামিয়ে দিতে দিতে মহম্মদ আলির ঢঙে বলেছিল: 'আই অ্যাম দ্য চাম্পিয়ন—জাস্ট ট্রাই অ্যাণ্ড টেক মাই টাইটল অ্যাওয়ে।'

ঘাসের উপর বল ড্রপ দিল আনন্দ। সার্ভিসের আগে তিনবার বল ড্রপ দেওয়াটা তার অভ্যাস। জিমি সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত সেট হারায়নি এখনো। কোয়ার্টার-ফাইনালে দেখেছে ট্যানারের ঘণ্টায় ১৪০ মাইলের সারভকে জিমি কী অবহেলায় তাচ্ছিল্যে পাণ্টা মার দিয়ে খুন করেছে। যত জোরে সারভ আসে ততই যেন জিমির সুবিধা হয়।

আনন্দ আপন মনে হাসল। জিম্বো, তোমার নাকি ছোটাছুটির স্পীড অকল্পনীয়, তোমার রিফ্লেক্স নাকি তুলনাহীন। দেখা যাক।

বলটা শূন্যে ছুঁড়ে র‍্যাকেটের ঘা দিল আনন্দ। সাইড লাইন আর সার্ভিস লাইনের কোনায় পড়ে কোনর্সের ব্যাকহ্যাণ্ডের নাগালের বাইরে দিয়ে বল বেরিয়ে গেল।

"ফিফটিন-লাভ।"

বাঁ দিকের কোর্টে সরে এল আনন্দ। ধীব মন্থর অলস তার হাঁটার ভঙ্গি। যেন ক্লাব টুর্নামেণ্টে প্রথম রাউণ্ড ম্যাচ খেলছে কোন শিক্ষার্থীর সঙ্গে।

সার্ভ করল আনন্দ।

সেই একই জায়গায় বল পড়ল। মসৃণ অথচ তীব্রবেগে। জিমি ডান দিকে ঝাঁপিয়ে ব্যাক হ্যাণ্ডে কোনরকমে র‍্যাকেট ছোঁয়াল। উঁচু হয়ে বলটা উঠল। হঠাৎ গুডলেংথ থেকে লাফিয়ে ওঠা বলে ব্যাট পাতলে সিলি-মিড অনের মাথার উপর যেরকম ক্যাচ ওঠে। সার্ভিস করেই আনন্দ ছুটে এসেছিল নেটের দিকে। জিমি বেসলাইনের উপর অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে দেখছে বলটা নেটের উপর আলতো ভাবে নামছে। বাঁ হাত কোমরে রেখে অতি অবহেলায় আনন্দ ফাঁকা কোর্টের আর-একপ্রান্তে ভলি মারল। খুব আস্তে টুং করে। ফিরে তাকালও না আর। যেন, এ তো জানা কথাই পয়েণ্ট পাব! তারপর আবার সারভ করার জন্য আলস্যভরে বেস লাইনের দিকে যেতে যেতে বল-বয়ের ছুঁড়ে দেওয়া বল থেকে একটা লুফে নিল।"

মাইক্রোফোনে আম্পায়ারের গলা : থার্টি-লাভ।"

আবার প্রচণ্ড সার্ভিস। সেনটার লাইনে খড়ির দাগ একটা জায়গায় হালকা ধোঁয়ার মত উড়তে দেখা গেল। 'এস'! দাগের

উপর বল পড়েছে। চারদিকের স্ট্যাণ্ডে গুঞ্জন উঠেই মিলিয়ে গেল। জিমি লাইনের দিকে তাকিয়ে দুহাত মুঠো করে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করল। সয়্যার করছে। গালাগাল দিচ্ছে। দিক। দিতেই হবে। জবাব দেবে কী করে এইরকম সার্ভিসের!"

"ফর্টি-লাভ।"

কী যেন বলেছিল জিমি রিপোর্টারের কাছে?—আই অ্যাম গেটিং বেটার। আই নাউ হ্যাভ মোর শট্‌স। দেয়ার ইজ নো প্রেশার অন মি। আত্মম্ভরিতা। ঠাণ্ডা মেজাজে, আনন্দ, ঠাণ্ডা মেজাজে খেলে যাও। পৃথিবীর এক-নম্বর তোমার সামনে। কাল রাত্রে যেমনি ছকে রেখেছ, ঠিক সেই ভাবে বরফের মত মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেলে যাও। মন্থর করো খেলাটাকে। জিমিকে নেটে আসতে দিও না, তাহলে তোমায় খুন করে ফেলবে। বেস লাইনে ঠেলে রাখো ওকে। তুমি যত মারবে, ততই ওর সুবিধা, যে ব্যাটসম্যানের হাতে স্ট্রোক আছে, ফাস্ট পীচ তাকে খুশি করে। কোনর্সের হাতে সবরকম মার আছে। মনে আছে উইম্বলডন-বিজয়ীদের-নাম-লেখা বিরাট বোর্ডটার উপরে কিপলিংয়ের লাইনটা ° যখন সবাই তোমার সম্পর্কে সন্দিহান তখন যদি নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে পার···

বিশ্বাস রাখো, আনন্দ। তুমি পারবে। পারবে। পারতেই হবে, কেননা—

সার্ভ করল আনন্দ।

বলটাকে ফোরহ্যাণ্ডে কোনর্স পেয়ে গেছে। আনন্দর ডানদিকে রিটার্নটা এল। সাইড লাইন বরাবর সে ফোরহ্যাণ্ডে মারল। কী অবিশ্বাস্য কোনর্সের ছোটা। নিমেষে বলের কাছে পৌঁছেছে। বিদ্যুৎগতি ক্রসকোর্ট শট এল আনন্দর ব্যাকহ্যাণ্ডে। বলটা সে

কোনর্সের কোর্টের মাঝামাঝি মারল। এইবার দু-হাতে র‍্যাকেট ধরে ভয়ঙ্কর ব্যাকহ্যাণ্ড মারবে ও।

কোনর্স মারল, এবং আনন্দ ঠিক সেইখানেই, যেখানে বল এল। যেন ও আগে থেকে জানত। স্টপ-ভলি করল আনন্দ সামান্য ঝুঁকে। কোনর্স ছুটে এসে চেষ্টা করল পাসিং শট। আনন্দর লম্বা হাতে বাড়ানো র‍্যাকেট বিদ্যুৎগতিতে বলটাকে মাঝপথে আটকে দিয়ে ফেরত পাঠাল কোনর্সের কোর্টে। নেটের-কাছে-দাঁড়ানো কোনর্স অসহায় ভাবে পিছনে তাকিয়ে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত মাটিতে পা ঠুকল।

"ফার্স্ট গেম টু ব্যানার্জি।"

এবারে কোনর্সের সার্বভিস। বিনীত মৃদু ভঙ্গিতে আনন্দ অতিরিক্ত বলগুলো যেভাবে নেট থেকে ব্যাট দিয়ে মেরে বোলারের কাছে ফেরত দেয় সেই ভঙ্গিতে এক-এক করে র‍্যাকেটে মেরে ধীরে ধীরে পাঠিয়ে দিল কোনর্সের কোর্টে। কোনর্সের বন্ধু নাসতাসে হাত মুঠো করে ঝাকাচ্ছে। ন্যাস্তি উৎসাহ দিচ্ছে।

আনন্দ তাকাল আম্পায়ারের পিছনে স্ট্যাণ্ডের দিকে। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চির ছোটখাট্ট একটা মানুষ, সঙ্গে স্ত্রী আর দুই ছেলে। বাইশ বছর আগে, আনন্দর জন্মেরও আগে প্রথম এখানে খেলেছে। আজও জিততে পারেনি। এবারের ফাইনালে কোনর্সের মুখোমুখি হলে কোনর্স ওকে খেয়ে ফেলবে। হয়তো কোনদিনই আর জেতা হবে না।

চোখাচোখি হল। আনন্দ মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানাল। রোজওয়াল মাথাটা সামান্য পাশে হেলাল। চোখে চাপা হাসি। অন্যদিক থেকে রোজওয়াল এবারেও ফাইনালে উঠেছে সেমি-

ফাইনালে নিউ-কোমবকে হারিয়ে। আনন্দর মনে হল, সে ওর ছেলের বয়সী।

কোনর্স সারভিস শুরু করতে যাচ্ছে—

"আগুন, আগুন, আগুন।"

খাটের উপর উঠে বসল আনন্দ। পুবের জানলা দিয়ে যতটা সম্ভব দেখার চেষ্টা করল। মাঠের উপর দিয়ে কারখানার কয়েকটা লোক ছুটে গেল। হৈ-চৈয়ের আওয়াজে মনে হচ্ছে আগুন কারখানাতেই লেগেছে।

দেখার জন্য আনন্দ ফটকের কাছে আসতেই বিপিনদার ধমক খেল।

"দেখতে হবে না। যাও, ঘরে যাও। সামান্য আগুন, নিভিয়ে ফেলেছে।"

খেলার মধ্যে হঠাৎ বাধা পড়ায়, আনন্দ আর মেজাজ পাচ্ছে না। বিছানায়-শুয়ে ঘড়ি দেখল। দুপুর দেড়টা। প্রথম সেটটা সে পর পর কোনর্সের তিনটে সার্ভিস ভেঙে নিয়ে নিল ৬—০ গেমে। আধমিনিটের মধ্যেই ব্যাপারটা চুকে গেল।

এবার দ্বিতীয় সেট।

সময় নষ্ট করে লাভ কী! এবারে ৬—১। তিনবার ডিউস হয়েছে। একটা গেম নিশ্চয়ই কোনর্স নেবে। অতবড় প্লেয়ার···৬-২ হতে পারে। দুটো গেম নিলে কী এসে যায় তার। লণ্ডনে নিশ্চয়ই প্রচুর ইণ্ডিয়ান আছে। বাঙালীও আছে। যারা লর্ডসে গিয়ে অপমানে খেপে, লজ্জায় মাথা নামিয়েছিল ৪২ রানের ইনিংস দেখে, তারা নিশ্চয় উইম্বলডনে এসেছে।

থার্ড সেট।

১—১; ১—২; ৩—৩; ৪—৪; ৪—৫। আনন্দ পিছিয়ে গেছে।

কোনর্সের সার্ভিস এবার। আগের গেমে প্রচণ্ড খেলে আনন্দর সার্ভিস ভেঙ্গে সে এগিয়ে এসেছে ৫—৪ হয়ে। আনন্দ চারদিকে তাকাল। মুখগুলো উত্তেজনায় টসটস করছে। ঠাসাঠাসি ভিড়ে লোক উপচে পড়ছে স্ট্যাণ্ড থেকে।

"লড়ে যা বাঙালী।"

একটা তীক্ষ্ণস্বর বাংলা শব্দগুলোকে সেণ্টার কোর্টের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আনন্দ একবার তাকাল স্ট্যাণ্ডের দিকে।

কোনর্স সার্ভ করেছে। বলটা জমিতে ছোবল দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"ফিফটিন—লাভ।"

মাথা ঠাণ্ডা রাখো, আনন্দ। জয় মুঠোয় আসতে এখনো অনেক পয়েণ্ট বাকী। কোনর্স দারুণ লড়তে পারে। আলগা দিও না।

বাঁ হাত কোমরে রেখে র‍্যাকেট-ধরা ডান হাতটা ঝুলিয়ে আনন্দ, যেন ম্যাচ খেলছে না, খেলা দেখছে এমন উদাসীন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। ক্লাব-টুর্নামেণ্টের মত যেন ব্যাপারটা। কোনর্স দুই আঙুলে 'ভি' দেখাল। ভিকট্রি? আনন্দর ঠোঁট তাচ্ছিল্যে মুচড়ে গেল।

সার্ভিস করেছে কোনর্স, প্রচণ্ড জোরালো। আনন্দ র‍্যাকেট ঠেকাতেই, থার্ডম্যানের দিকে ক্যাচ ওঠার মত বল ছিটকে স্ট্যাণ্ডের দিকে চলে গেল।

"কাম অন্ ব্যানার্জি।"

"থার্টি-লাভ টু কোনর্স।"

"বাঙালী জা-গ-ও।"

আনন্দ হেসে ফেলল।

"হচ্ছে কী আনন্দ। স্টেডি স্টেডি।"

"প্লিজ রিফ্রেন ফ্রম এনি রিমার্কস।"

নাসতাসে ডান হাতের ঘুঁষি বাঁ হাতের তালুতে মারছে। কোনর্স 'ভি' দেখাল মুখ ভেঙ্‌চে। আনন্দ আড়চোখে লক্ষ্য করল, রোজওয়াল তার দিকে তাকিয়ে। কী বিষণ্ণ দুঃখী চাহনি। বুকটা মুচড়ে উঠল আনন্দর। ঘাবড়াচ্ছ কেন! তুমি নিশ্চিত থাকো, আমিই ফাইনালে যাব। সেখানে তুমি আমাকে হারাবে।

কোনর্সের সার্ভ। আনন্দ প্রচণ্ড ফোরহ্যাণ্ড মারল। নেট ঘেঁষে সাইড লাইন ছুঁয়ে বল বেবিয়ে গেল।

"থার্টি-ফিফটিন।"

কোনর্স সারভ করল। দুর্দান্ত ব্যাকহ্যাণ্ড রিটার্ন তার বাঁ দিকে।

"থার্টি—অল।"

এবারের সারভিসটাও দারুণ রিটার্ন করল আনন্দ। ডাউন দ্য লাইন বেবিয়ে গেল পনেরো হাজার লোককে চমকে দিয়ে। তারপর উচ্ছ্বাসের বিরাট একটা শব্দে সেণ্টার কোর্ট কেঁপে উঠল। আনন্দ গেমটা জিতেছে। এখন ৫—৫।

সেটটা জিতলেই ম্যাচটাও জেতা হয়ে যাবে। ক্লান্ত বোধ করল আনন্দ। এখুনি জিতে কী লাভ! আকাশ জুড়ে গনগনে কারখানার ফার্নেসের মত তাপ ছড়িয়ে। ফার্নেসের খোলা দরজাটার মত সুর্য। গরমে ঘামে এক ধরনের আলস্য আনন্দের চোখে জড়িয়ে এল।

ফাইনালে রোজওয়ালের কাছে কি হেরে যাব? ইণ্ডিয়াকে এত-

বড় সম্মান থেকে বঞ্চিত করব ? কৃষ্ণণ দুবার সেমিফাইনালে উঠেছে। ব্যস্, তারপর এই আনন্দ ব্যানার্জি। টেনিসের সব থেকে বড় সম্মান মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দেব ? ভারতের ষাট কোটি লোক কী দারুণ আশা নিয়ে অপেক্ষা করবে রেডিওয় কান পেতে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভিড়। পটকা-বোমা নিয়ে নেতাজী পার্কে আড্ডা দেওয়া ছেলেগুলো চেঁচাচ্ছে—"আন্দোরে আন্দো ওই যে ফাস্ট বল করতো, নেটে একদিন মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল একটা ছেলের। শান্ত চুপচাপ থাকতো। ও যে এমন টেনিস খেলে! হোক্ না বটতলার ছেলে, আমাদেরই পাড়ার।" পটকা ফাটাবার জন্য ওরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করবে। মেজদা তো অফিসই যাবে না। বাবা অবশ্য ঠিকই বেরোবে, চেম্বারেও বসবে। হাবুর মা বার বার হয়তো বিপিনদাকে জ্বালাবে—"হ্যাঁ গা, আমাদের আন্দো সাহেবের সঙ্গে কিসের লড়াই করতে গেছে ? ছেলেটা বড় দুব্লা, পারবে তো ?" আর অমল কী করবে!

জানে, একমাত্র অমলই জানে কেন আমি ফাইনালে উঠতে চেয়েছিলাম। ফাইনালে কি রেজাল্ট হবে তাও জানে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর খেলতে খেলতে রোজওয়ালের মুখে ছাপ পড়ে গেছে চিন্তার, উদ্বেগের। চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে গেছে। মুখের চামড়া খসখসে মোটা আলগা হয়ে এসেছে। শরীর আর কুড়ি বছর বয়সের মত ধকল নিতে পারে না। কী কষ্ট করে একটা লোককে সারা পৃথিবীর 'সেরা'দের চ্যালেঞ্জ ঠেলে বাইশ বছর টিঁকে থাকতে হয়েছে। টেনিসের সব সম্মানই পেয়েছে শুধু সেরা সম্মানটি ছাড়া। একেই বলে বরাত! সেই বরাতকে কি হারানো যায় না ?

একদিকে ষাট কোটি আর একদিকে মাত্র একজন। শ্রীকৃষ্ণ হলে কী করতেন ? রোজওয়াল কি অর্জুন! যদি হেরে যাই তাহলে পরের

বছর কিম্বা তার পরের বছর জিততে পারি। কিন্তু রোজওয়াল আর পারবে না।

ষাট কোটি লোকের এত আশা, এত আকাঙ্ক্ষা চুরমার করে দেব, একজনের জন্য? অমল কি এই বিদঘুটে সমস্যাটার কথা ভেবেছে কখনো? একটা এত বড়ো দেশ, মানসম্মান কখনো পায়নি, শুধুই পিছনে, সকলের পিছনে। সারা পৃথিবী ভুলেই গেছে এত বড় একটা দেশ স্পোর্টস জগতে আছে; দেশটার মানুষও ভুলে গেছে খেলাধুলোয় তারা কিছু করতে পারে। হারের পর হার দেখতে দেখতে নুয়ে পড়েছে, বিশ্বাস করছে তারা অপদার্থ তাদের দ্বারা ফাস্ট বোলিং হবে না, টেনিস চ্যামপিয়ন সম্ভব নয়। এই দেশটা চমকে জেগে উঠে শিরদাঁড়া সোজা করে তাকাবে যদি আনন্দ উইম্বলডন জেতে। ষাট কোটি মানুষ, ভাবা যায়! আর তার বদলে একজনের, মাত্র একজনের সাধ কিংবা বলা যায় সখ, মেটাবার জন্য এত মানুষকে ডুবিয়ে দেওয়া! কি করব এখন? দেশের জন্য না নিজের জন্য? বেচারা রোজওয়াল, কী সাধনা, মনের জোর—এসব কি ব্যর্থ হবে শেষ পর্যন্ত? দেশ বড়ো না একটা লোক বড়ো?

আনন্দ ছটফট করে বিছানার এধার থেকে ওধার গড়াগড়ি দিল।

'কিছু একটা ইণ্ডিয়াকে দোব। একটা, একবার, শেষ সুযোগের সামনে একবার…'

ছটফট করতে করতে আনন্দ একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘণ্টা দুয়েক গভীর ঘুমের পর আপনা থেকেই সে জেগে উঠল। উত্তরের জানলা দিয়ে আকাশে চোখ মেলে দেখল, ঘন মেঘে ছেয়ে রয়েছে। ঘুমোবার আগে ছিল গনগনে রোদ। বহুদূরে দমদমে নামার জন্য একটা জেট প্লেন নিচু হচ্ছে। তার হঠাৎ মনে পড়ল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট টিম

এবার আসবে। ইংল্যাণ্ডে সত্ত-থেঁতলে-যাওয়া ভারতকে এবার ওরা মাড়িয়ে যাবে—কারা কারা আসবে টিমে?

এখনো টিমের নাম অ্যানাউন্স করেনি। শুধু করেছে ক্যাপ্টেনের নাম, লয়েড। সোবার্স বলেছে, আমি রিটায়ার করিনি, তার মানে আসতেও পারে। কানহাইও। কালীচরণ, রো, ফ্রেডেরিকস, বয়েস, মারে, হোল্ডার, গিব্‌স, এরা তো আসবেই। আর অ্যাণ্ডি রবার্টস। উফ্‌ফ্‌, কী টিম! এদের এগেনস্টে বোলিং!

চকচক করে উঠল আনন্দর চোখ। তছনছ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ভারতকে। মুহ্যমান লোকেরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে রীলে শুনছে আর হতাশায় মাথা নাড়ছে—এমন একটা দৃশ্য চোখের উপর ভেসে উঠতেই টেপ রেকর্ডারটা চালিয়ে, সেটা বুকের কাছে ধরে সে ফিসফিস বলতে লাগল: "আকাশবাণী, এখন খবর পড়ছি ইভা নাগ। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হল, বোম্বাইয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পঞ্চম ও শেষ টেস্ট খেলার জন্য ভারতীয় দলের নাম ঘোষিত হয়েছে। বাংলার ফাস্ট বোলার আনন্দ ব্যানার্জি চোদ্দোজনের মধ্যে স্থান পেয়েছেন।"

সারা বিকেল সে এই কথাগুলো বাজিয়ে বাজিয়ে শুনল।

॥ আট ॥

"ব্যানার্জি তুমি খেলছ।"

এতক্ষণ কাঠ হয়ে বসে ছিল আনন্দ, ড্রেসিংরুমের কোণের চেয়ারটায়। পাশের ঘরে তখন সিলেকশন কমিটির মিটিং চলছিল। পাণ্ডুরং সালগাঁওকর না আনন্দ ব্যানার্জি, কে খেলবে? ঘরের আর এক কোণে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে পাণ্ডু একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে। দুজনের মনে একই চিন্তা, কে বাদ যাবে। পতৌদির নিথর ডান চোখ কিছুক্ষণ গেঁথে রইল আনন্দর মুখে, তারপর পিঠে চাপড় দিয়েই তাকাল সালগাঁওকরের দিকে।

"সরি পাণ্ডু।"

সালগাঁওকরের মুখটা কিছুক্ষণের জন্য ফ্যাকাসে হয়ে রইল। বহুদিন ধরেই তার নাম আলোচিত হচ্ছে ভারতের সম্ভাব্য ওপেনিং বোলার হিসাবে। আজকের টাইমস অফ ইণ্ডিয়ায়, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে, স্টেটসম্যানেও তাকে দলে নেবার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সব কাগজই বলেছে, ব্যানার্জি বড্ড কাঁচা, এখনই বিশ্বের সেরা মারকুট্টে ব্যাটসম্যানদের সামনে ওকে ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না। যদি বেধড়ক মার খায় তাহলে কেরিয়ার শেষ হয়ে যেতে পারে। সকালে কাগজে এইসব পড়তে পড়তে আনন্দ নিশ্চিত হয়ে গেছল এগারোজনের মধ্যে তার জায়গা হবে না। তাই পতৌদির বাড়ানো হাতটা ধরতে ভুলে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে

রইল। সেই সময় সালগাঁওকরই এগিয়ে এসে তার বিরাট মুঠোয় আনন্দর ডান হাতটা ধরে বলল, "আমি কিছু মনে করছি না। কেউ একজন তো বাদ যেতই। তোমার বদলে আমি হলাম। তুমি সাকসেসফুল হও এটাই চাই।"

অনেকেই কনগ্র্যাচুলেট করে গেল। আনন্দ শুধু "থ্যাংক ইউ" বলা ছাড়া আর কোন কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারল না। অবশ্য বলার আছেই বা কী। সকলেই বয়সে বড়। ওরা পরস্পরকে ডাকে অদ্ভুত সব ডাকনামে—ভেঙ্কটরাঘবন 'ভেঙ্কি', বিশ্বনাথ 'ভিশ্', সুনীল গাভাসকর 'সানি', একনাথ সোলকর 'একি', প্রসন্ন 'প্রাস' এইরকম আর কী। মেজদা বলে দিয়েছে, ওরা তোমার থেকে অনেক বড়। ছোট ছোটর মতই থাকবে।

আর ঠিক আধঘণ্টা বাকি ফিফথ টেস্ট ম্যাচ শুরু হতে। আনন্দ ড্রেসিংরুম থেকে নেমে এল মাঠে। নতুন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। ইডেনের মত অত বড় নয়। নেট-প্র্যাকটিস করছে দুটো টিমই। গীবস, বয়েস, সোবার্স বল করছে। কালীচরণ নেটের মধ্যে।

ইণ্ডিয়ান নেটে ফারুক। একটা বল নিয়ে মিডিয়াম-পেসে আনন্দ বল করল কয়েকটা। ব্রিজেশ, মাঁকড় আর সোলকর অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে, ক্যাচিং প্র্যাকটিস করাচ্ছে প্রসন্ন। আনন্দ গিয়ে দাঁড়াল ব্রিজেশের পাশে। মালীরা এসেছে নেট তোলবার জন্য। পতৌদি আর লয়েড টস করতে নামছে। গেস্ট ব্লকে মেজদা বসে। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বোম্বাই এসেছে। কাল রাত্রে হোটেলে দেখা করে শুধু বলেছিল, "আনন্দ, ঘাবড়াচ্ছিস?"

"ঘাবড়াব কেন, তবে বুকের মধ্যে—"

মেজদা হাসিমুখে বলেছিল, "সব অসুখই সারে। তুইও সেরে উঠবি।"

পতৌদি টসে জিতেছে। কিন্তু ইণ্ডিয়া ব্যাট করছে না। রবার্টস, সোবার্স, বয়েসের কথা ভেবে, তাজা পীচ ওদের হাতে তুলে না দিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকেই ছেড়ে দিয়েছে আনন্দর বলের সামনে।

আনন্দর হাতে বল। জীবনের প্রথম টেস্টের প্রথম ওভার। ফ্রেডেরিকস গার্ড নিয়ে ক্রিজে আঁচড় কাটছে। পতৌদি ফিল্ড সাজাচ্ছে।

"গালিকে ফোর্থ স্লিপ করে দেব?"

আনন্দ বোকার মত মাথা নাড়ল।

"থার্ডম্যান রাখার দরকার আছে?"

আনন্দ আবার মাথা নাড়ল।

পতৌদি আর-কিছু জিজ্ঞাসা না-করে ফিল্ড সাজাল। গাড়েওয়ার প্যাভিলিয়নের দিকে চব্বিশ স্টেপ নিয়ে বুটের স্পাইক দিয়ে ঘাসে আঁচড় কাটার পর আনন্দ মুখ তুলেই দেখল গ্যালারিতে দুটো টি ভি ক্যামেরা—এখন হয়তো তাকেই তাক্ করে আছে। আনন্দর বুক ঢিবঢিব করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ঘুরে গিয়ে ব্যাটসম্যানের দিকে তাকাল। তখন ফ্রেডেরিকস পিছনটা একবার দেখে নিয়ে স্টান্স নিল।

"প্লে।"

আম্পায়ার রুবেন্স পাশে তুলে রাখা বাঁ হাতটা নামিয়ে ঝুঁকে পড়ল।

আনন্দ একবুক নিঃশ্বাস টেনে চোখ বন্ধ করল। তারপর ছুটতে শুরু করল বল হাতে। পঞ্চাশ হাজার লোকে ভরা স্টেডিয়াম শ্বাস-রুদ্ধ কৌতূহলের চাপে বোবা হয়ে গেল মুহূর্তে। এই সেই বোলার, যে একটাও ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ না-খেলেই টেস্ট খেলছে। সিলেক্টাররা ওর মধ্যে কী দেখে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সামনে নামিয়েছে? অবশ্য প্রথম

চারটি টেস্টেই হেভি ইনিংস ডিফিটের পর আর-একটা ডিফিটে কিছু এসে যায় না। তাহলেও সালগাঁওকর ছিল, মহীন্দর অমরনাথ ছিল, ঘাউড়ি ছিল। তা নয়, কোথাকার এক বোলার, বেঙ্গলেও যাকে কেউ চেনে না, একে টেস্ট খেলাবার কোন মানে হয় ?

ওরা উদ্‌গ্রীব হয়। কে এই ব্যানার্জী! কেমন বল করে, কত জোরে করে!

ব্যাটের ঠিক মাঝখানে বল মারার মিষ্টি একটা শব্দ। লেগ স্টাম্পে ফুলটস। ল্যাটা ফ্রেডেরিকস এক জায়গায় দাঁড়িয়েই অন-ড্রাইভ করেছে। স্কোয়ার-লেগ থেকে ব্রিজেশ প্যাটেল নিয়মরক্ষার জন্য কয়েক পা ছুটে থেমে গেল। একটা পুলিশ বাউণ্ডারি থেকে বলটা ছুঁড়ে দিল।

প্রথম বলে চার। আনন্দর কান দুটো গরম হয়ে উঠল। রাতে একবার ভেবেছিল, প্রথম বলেই স্টাম্প ছিটকে দিয়ে মাঠে হৈ চৈ ফেলে দেবে। এঞ্জিনীয়ার ফার্স্ট স্লিপ বিশ্বনাথকে কী যেন বলল। বিশ্বনাথ মাথা নাড়তে নাড়তে পাশের গাভাসকরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

দ্বিতীয় বল। বলটা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দর বুক হিম হয়ে গেল। ইন সুইংটা এত বড় হয়ে যাবে ভাবেনি। তাও শর্ট পীচ। মাঁকড় ভয়ে মাথা নিচু করল। স্কোয়্যার-কাটের শব্দটা চাবুকের মত আনন্দর মুখে আছড়ে পড়ল। কভার থেকে পতৌদি হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল পয়েণ্ট বাউণ্ডারির দিকে, মাঠের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া বলটা আনতে। বলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আনন্দর দিকে ছুঁড়ে দিল।

তৃতীয় বল।

হাঁটুটা কাঁপছে। কাঁধে যেন একশো কেজির চালের বস্তা চাপানো। লেংথ আর ডিরেকশ্যন এবার এ দুটো যেন ঠিক থাকে। স্রেফ সোজা বল। সুইং-টুইংয়ে ওস্তাদি নয়। একটু শুধু ঠুকে দেওয়া।

সপাটে পুল। চার। এতটা শর্টপীচ হয়ে যাবে আনন্দ ভাবেনি।

বলটা পতৌদি কাছে এসে হাতে দেবার সময় বলল, "ঘাবড়ো মাৎ।"

মাথা নিচু করে বোলিং মার্কে ফিরে এল আনন্দ। পিছন থেকে একটা চিৎকার এল—"গুড বোলিং ফর লেডিজ ক্রিকেট।"

দরদর ঘামছে আনন্দ। প্যান্টে হাত মুছল। একটা বাউনসার দিলে কেমন হয়? যদি ব্রিজেশের কাছে ক্যাচ ওঠে।

না-হুক্, না-পুল ধরনের একটা শট্। ফাঁকা মিড উইকেট দিয়ে বলটা বাউণ্ডারিতে গেল। চার বলে ষোল রান। চারদিকে বেশ সোরগোল। আনন্দ কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছে না। কিছু বুঝতে পাচ্ছে না। লজ্জায় অন্ধ হয়ে গেছে, কালা হয়ে গেছে। এখন কোনরকমে মাঠ থেকে পালানো যায় যদি।

"কিপ দ্য বল ওয়েল আউটসাইড দ্য লেগ স্টাম্প।"

পতৌদির গলাটা কেমন কঠিন। আনন্দ মাথা নাড়ল।

ফিফথ বল। রুবেন্স দুহাত মেলে ধরল। ওয়াইড-বল।

সবাই বুঝে গেছে ব্যানার্জি নার্ভাস হয়ে পড়েছে। পালাবার একমাত্র উপায় ইনজিওর্ড হয়ে যাওয়া। পা মুচকে? টেরিফিক শট আটকাতে গিয়ে আঙুল ভেঙে? বল ধরতে ঝাঁপিয়ে কাঁধের হাড়ের ডিসলোকেশন?

পরেরটা হল নো-বল, ফ্রেডেরিকস হাঁকড়েছে। আনন্দর মাথার

উপর দিয়ে ছয় হতে হতেও হল না। বাউণ্ডারির হাত খানেক ভিতরে পড়েছে।

আরো দুটো বল করতে হবে। ছ বলে একুশ রান হয়েছে। ফ্রেডেরিকসের কুড়ি, একটা ওয়াইড, এবার পালাতে হবে। মাস্‌ল পুল তো হতে পারে! ফার্স্ট ওভারেই কি হওয়াটা উচিত হবে? লোকে ঠিক ধরে ফেলবে—ব্যাটা মার খেয়ে পালাচ্ছে।

এবার লেংথে সোজা বল, একটু স্লো। ফ্রেডেরিকস এবারও মারের বল পাবে ভেবেছিল। পা বাড়িয়ে ড্রাইভ করার জন্য ব্যাট তুলে যখন বুঝল বলটা মারলে উঠে যাবে তখন ব্যস্ত হয়ে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলতেই বলটা সামনে একটু উঠে গেল। আনন্দ হাত বাড়িয়ে ঝাঁপাল।

আর উঠছে না সে। ছুটে এল সবাই। বলটা মাটিতে পড়েছে, তার উপর পড়েছে ওর বুক। শরীরের চাপে বলটা পাঁজরে, ঠিক যেখানে হার্ট—সঙ্গে সঙ্গে সেন্সলেস।

"আনন্দ, আনন্দ।"

চোখ বুঁজে আনন্দ হাঁফাচ্ছে। বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানিটা কীরকম অদ্ভুত একটা ব্যথা তৈরী করছে। একগোছা তীক্ষ্ণ ছুঁচ যেন পর পর বিঁধিয়ে যাচ্ছে। নিশ্বাস নিতে গেলে লাগছে।

"আনন্দ?"

চোখ খুলে তাকাল। জানলার বাইরে অমল।

"শুনেছ, ডগুদাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।"

"কেন, কবে, কী করেছে?"

"কারখানায় সেদিন যে আগুন লেগেছিল, ওটা নাকি ডগুদার

কাজ। পুলিশের কাছে ওরা নালিশ করেছিল তাই ওকে ধরে নিয়ে গেছে, কোর্টে কেসও উঠেছে।"

"এত ব্যাপার হয়ে গেল, আর আমি কিছুই জানি না! ডগুদা কোথায় ?"

"জেলে।"

"জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে আনা হয়নি ?"

"কে জামিন দাঁড়াবে? ওর ভাইয়েরা বলেছে, আমরা কিছু পারব-টারব না। মা চেয়েছিল জামিন হতে, কিন্তু আমাদের তো টাকা বা বিষয়-সম্পত্তি কিছুই নেই।"

"ডগুদা আগুন লাগিয়েছে, হতেই পারে না। মিথ্যে কথা। কে দেখেছে ?"

"দু-তিনজন ডগুদাকে নাকি কারখানার পিছনে যেদিকে আগুন লাগে, সেদিক থেকে আসতে দেখেছে। কালকেই মামলা উঠবে। এছাড়াও ডগুদা নিজেই তো একদিন চিৎকার করে বলেছিল আগুন লাগিয়ে দোব।"

"রাগের মাথায় ওরকম কথা সবাই বলে। তার মানে এই নয় যে, সত্যি সত্যিই আগুন দেবে। মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। আমি শ্যিওর। এই মাঠটাই হচ্ছে সবকিছুর মূলে, শিবা দত্ত এটাকে গ্রাস করতে চায়। ডগুদাই হচ্ছে কাঁটা।'

"তোমার বাবা ওদের উকিল দাঁড়িয়েছে।"

আনন্দর মুখ মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাসে হল। চোখে ফুটল অসহায়তা।

"আমি কী করতে পারি।"

"না না, এমনিই বললাম. আমি এখন চলি।"

আনন্দ কিছু বলার আগেই জানলা থেকে অমল অদৃশ্য।

বিপিনদা ঘরে ঢুকল। তাকে ট্যাবলেট খাইয়ে চলে গেল।

আমি কী করতে পারি! আনন্দ ভাবতে শুরু করল ঘরে পায়চারি করতে করতে। ডগুদা পরের উপকার করার জন্য সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। একটা আদর্শ আছে, আদর্শবাদী লোক। তাই বিয়ে পর্যন্ত করেনি। সেকালে বিপ্লবীরাও নাকি এই রকম ছিলেন, দেবুদাই বলেছিলেন বিপ্লবীরা সংসারী হতেন না দেশের সেবা করার জন্য। ডগুদা সম্পর্কে বলেছিলেন, ইডিয়ট, লেখাপড়া করেনি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, আছে শুধু গোঁয়ার্তুমি আর সারল্য। জীবনে এরাই পস্তায়। ডগুদা পরোপকার করতে গিয়ে এখন পস্তাচ্ছে। দেবুদা শুনে নিশ্চয় খুশি হবে। হঠাৎ আনন্দর মনে ভেসে উঠল একটি মুখ। পুরুলেন্সের চশমা, লম্বাটে চোয়াল, বিরাট একটা মাথা—দেবুদার মুখ। আশ্চর্য! আনন্দ মনে মনে বলল পায়চারি থামিয়ে, আশ্চর্য এতক্ষণ এটা কেন মনে আসেনি! দেবুদা তো উকিল, সেই তো ডগুদার জন্য মামলা লড়তে পারে। ছাড়িয়ে আনার জন্য প্যাঁচালো যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বড় উকিল হবার এই তো সুযোগ দেবুদার সামনে। ফী নিশ্চয়ই চাইবে না, ব্রিফলেস উকিলকে সেধে মামলা দিলে বর্তে যাবে। মামলায় জিতলে বেকসুর ডগুদাকে খালাস করতে পারলে দেবুদার নাম হবে। তখন লাইন পড়ে যাবে ওর বাড়িতে। এটা ওর মাথায় ঢোকাতে যদি পারা যায়।

॥ নয় ॥

"তোর বাবা তো শুধু বোঝে আইন। আর, শুধু আইন মুখস্থ থাকলেই কি উকিল হওয়া যায়?"

ডান হাতের তর্জনী দিয়ে দেবুদা কপালে তিনটে টোকা দিল।

"নিশ্চয়, ব্রেনই তো আসল জিনিস। স্কুলমাস্টার কি ঔপন্যাসিক কি ডিটেকটিভের মত উকিলেরও দরকার ব্রেন। মেইগ্রের ব্রেন আছে বলেই তো—"

আনন্দ ইচ্ছে করেই শেষ করল না। তক্তপোশে আধ-শোওয়া দেবুদা মুচকি মুচকি হাসছে। মেজাজটা মনে হচ্ছে ভালই রয়েছে।

"তাহলে ডগুদার কেসটা কী হবে?"

"আরে দূর, এসব ছোটখাট ব্যাপারে আমাকে টানাটানি কেন।"

"ছোটখাট! একটা লোক বিনা দোষে জেল খাটবে, ষড়যন্ত্রের শিকার হবে, আর একে ছোটখাট বলছেন? ধরুন একটা লোককে মিছিমিছি খুনের সঙ্গে জড়িয়ে অকাট্য সব প্রমাণ রেখে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া হল। ধরুন না মেইগ্রের সেই কেসটা যেটা একদিন বলেছিলেন আমাকে।"

দেবুদা ভ্রু কুঁচকে বলল, "কোনটা?"

"সেই যে গ্রামের খিটখিটে ঝগড়ুটে বুড়ীটাকে একদিন তার ঘরে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। এয়ার রাইফেলের গুলিতে মরেছে।

সবাই সন্দেহ করল গ্রামের পাঠশালার মাস্টারকে। তার সঙ্গে বুড়ীর প্রায়ই ঝগড়া হতো। মাস্টার বাইরে থেকে এসেছে, গ্রামের লোকেরা তার শহুরে হাবভাব ভাল চোখে দেখত না, তাই তাকে ভীষণ অপছন্দ করত। গ্রামের পুলিশও মাস্টারকে সন্দেহ করছে। মাস্টারের ছেলের এয়ার রাইফেল আছে, অবশ্য অন্য বাড়িতেও আছে। তা ছাড়া মাস্টারের বাড়ি থেকে বুড়ীর ঘরটা দেখা যায়। মাস্টার ভয়ে ছুটে এল প্যারিসে মেইগ্রের কাছে আকুল আবেদন নিয়ে—আমাকে বাঁচান। মেইগ্রে তখন কী করল ?"

"জানি।"

"বলতে পারত তো আমাকে আবার টানাটানি কেন ? আমি শহরের পুলিশ, গ্রামের পুলিশের এলাকায় নাক গলাবার অধিকার নেই। কিন্তু গ্রামে গেল তো সে মাস্টারের সঙ্গে ! লোকটার উপর কি শুধু মায়াই পড়ে গেছল ? মানবিকতা বলে একটা ব্যাপারও তো আছে।"

"তুই তো বেশ গালভরা পাকাপাকা কথা শিখেছিস। উকিল হবি নাকি বাবার মত !"

"দেবুদা, আমার কিন্তু স্থির বিশ্বাস, ডগুদার কেসটা পেলে মেইগ্রে ঠিক নিয়ে নিত। বুদ্ধির ব্যাপার আছে যে !"

উঠে বসল দেবুদা। চশমাটা পাঞ্জাবির খোঁটায় মুছে চোখে লাগিয়ে পিটপিট করে তাকাল !

"কী বুদ্ধির ব্যাপার ?"

"তা আমি কী করে জানব ! একটা নিরপরাধ লোককে প্যাঁচে ফেলা হয়েছে, তাকে ছাড়িয়ে আনতে নিশ্চয় বুদ্ধি লাগবে। সাক্ষীদের জেরা করে, কি তাদের প্রমাণগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, কি ডগুদা

তখন অন্য জায়গায় ছিল এইরকম কিছু প্রমাণ দিয়ে প্যাঁচটাকে খুলে ফেলতে হবে। মেইগ্রে হলে ঠিক পারতো।”

দেবুদা ডান তালু দাড়িতে ঘষতে ঘষতে আড়চোখে কয়েকবার আনন্দর মুখের দিকে তাকাল।

“তবে মুশকিল কী জানেন দেবুদা, বাবার সঙ্গে আপনি পারবেন কিনা তাই নিয়ে আমার বেশ—”

আনন্দ টেবলে টাইমপীসটার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। দেবুদার গাল-ঘষা বন্ধ হয়ে গেছে।

“কালকেই কেস আছে বললি। খরচ-টরচ দেবে কে?”

“মেইগ্রে তো নিজের খরচেই মাস্টারের সঙ্গে গ্রামে গিয়েছিল। নিজের খরচেই হোটেলে ছিল।”

“তাই বলে আমাকেও কি পকেট থেকে টাকা বার করতে হবে? একটা পয়সাও আমি খরচ করতে পারব না।”

দমে গেল আনন্দ। দেবুদা রাজি হয়েও পিছিয়ে যাচ্ছে। বেচারা ডগুদা, বিনাদোষে জেল খাটবে। মিথ্যে মামলার ফাঁস থেকে ওকে বার করে আর কে আনতে পারে। শুকনো মুখে আনন্দ বলল, “ডগুদা ওই মাঠটাকে পাড়ার ছেলেদের খেলার জন্য বুক দিয়ে আগলে রাখে, শিবা দত্তর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে, মাঠটার দলিলে কি লেখা আছে ডগুদা তা জানে, ওর জন্যই মাঠটাকে ওরা গ্রাস করতে পারছে না। একটা ভাল লোক অযথা জেলে যাবে আর আমরা কিছু করব না?”

“করতে গেলে টাকা লাগে।”

“কোথায় পাব? ডগুদার বাড়ির কেউ একটা পয়সাও দিতে রাজি নয়।”

"তাহলেই বোঝ্ কি রকম লোক। জেল খাটুক অভিজ্ঞতা হবে।"

আনন্দ যাবার আগে শুধু বলল, "মেইগ্রে পড়ে আপনি কিচ্ছু বোঝেননি।"

সন্ধ্যা উতরে রাত শুরু হয়ে গেছে। এতক্ষণ বাইরে থাকার অনুমতি তার নেই। দেবুদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আনন্দ জোরে হাঁটতে শুরু করল। পর পর কদিন রাতে বৃষ্টি হয়েছে। বাতাস জোলো। দেবুদা কাল তাহলে অ্যাপিয়ার হবে না। অন্ধকার খেলার মাঠটার মধ্য দিয়ে যাবার সময় একটা ইট পায়ে লাগতেই অভ্যাস-বশত কুড়িয়ে নিল। সাইজটা ক্রিকেট বলের। নিশপিশ করে উঠল ওর ভিতরের রাগ আর দুঃখের মতই কাঁধের পেশীগুলো। তিন আঙুলে ইঁটটাকে ধরে সে ছুটতে ছুটতে লাফিয়ে উঠে বল করার মত ছুঁড়ল কারখানার দেয়ালে।

দেয়ালে ইট লাগার শব্দটা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ডান হাতে সে বুক চেপে ধরল। মনে পড়ল তার বুকে চোট। এট্রিয়াল ফাই-ব্রিলেশন নয়, ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ফ্রেডেরিকসের ক্যাচ ধরতে গিয়ে বলের উপর বুক দিয়ে পড়েছে। এখন সে বোম্বাইয়ে।

বুকে হেভি ব্যাণ্ডেজ। ডাক্তার বলেছে শুয়ে থাকতে। পুরো রেস্ট। কাল মাঠ থেকেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। এক্স-রে হয়েছে। পাঁজরার হাড়ে ক্র্যাক দেখা গেছে। কেবিনে রাখা হয়েছে।

ট্রানজিস্টারে কান পেতে আনন্দ শুয়ে। সেকেণ্ড-ডে লাঞ্চে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—টু ফর ফোর হানড্রেড সেভেনটি। দু' উইকেটে চারশো সত্তর। কালীচরণ ব্যাটিং দুশো চার, কানহাই ব্যাটিং হানড্রেড

ফিফটি। ফ্রেডেরিকস সত্তর, আর একজন পনেরো, বাকীটা এক্সট্রা।

আউট!

লাঞ্চের পর প্রসন্নর প্রথম বলেই কালীচরণ শর্টলেগে সোলকারের হাতে!

কে আসছে? লরেন্স রো! রিলেওলারা কী যে বলে। আনন্দ কানের কাছে সেটটা ধরল ঠিক মেজদার মত। (ওহ্, কাল মেজদাও হাসপাতালে এসেছিল, আজ সকালেও। ইণ্ডিয়া টিমেরও সবাই এসেছিল।)

সোবার্স। আশ্চর্য, সোবার্সকে দেখে চিনতে পারে না? পতৌদি অ্যাটাকিং ফিল্ড সাজিয়েছে। নিউ ব্যাটসম্যান!

কানহাই-সোবার্স। তিন উইকেটে চারশো সত্তর। আর কতক্ষণ ব্যাট করবে? টি-এ ডিক্লেয়ার করা উচিত। সোবার্স পনেরো মিনিটে মারল প্রথম চার, বেদীকে। নেক্সট পনেরো মিনিটে ত্রিবিশ। আশি মিনিটে একশো এক। কানহাই ততক্ষণে মাত্র বারো।

লয়েড ডিক্লেয়ার করল। লাঞ্চের পর একশো মিনিট ব্যাট করেই। সাড়ে পাঁচশো মিনিটে থ্রি ফর সিক্স হাণ্ড্রেড টোয়েন্টি। টি-এর আগে দশমিনিট ইণ্ডিয়াকে ব্যাট করতে দিয়ে কী এমন লাভ হবে!

অন্ধকার মাঠের উপর দিয়ে কয়েকটা লোক কথা বলতে বলতে চলেছে আনন্দদের বাড়ির দিকে। মাঠের উপর বিকেলে কয়েকটা ড্রাম নামিয়ে রেখে গেছে কারখানার লরি। আনন্দ এতক্ষণ তারই একটার উপর বসে। লোকেদের কথার শব্দে বোম্বাই টেস্টম্যাচ থেকে সে মুহূর্তে ফিরে এল বাস্তবে।

আনন্দ ওদের পিছু পিছু বাড়ির দিকে এগোল। মাথা ভার-ভার লাগছে, গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা।

"উকিলবাবু যা-যা শিখিয়ে দেবে, মুখস্থ করে ফেলবি। ঠিক সেই-ভাবে বলবি।"

কথা বলতে বলতে ফটক পেরিয়ে ওরা ঢুকছে। আনন্দ দেখল দুটি অল্পবয়সী ছেলে আর শিবা দত্তর ম্যানেজার।

বিপিনদা সিং-দরজার কাছে উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে; আনন্দকে দেখা মাত্র ফেটে পড়তে গিয়েও পড়ল না।

"এ কী চোখমুখের অবস্থা হয়েছে। গা পুড়ে যাচ্ছে যে!"

"বিপিনদা, আমাকে ঘরে নিয়ে চলো।"

এইটুকু বলেই আনন্দ বিপিনদার বাহু আঁকড়ে হাঁফাতে লাগল।

"কী যে এক অসুখ, চিকিচ্ছেও কিছু নেই। সন্ধ্যে থেকে আমি খোঁজাখুঁজি করছি। মেজবাবু জানতে পারলে আমাকে আস্ত রাখবে না।"

আনন্দ সারারাত জ্বরের ঘোরের মধ্যে কাটাল। এক-একবার চমকে উঠে কান পেতেছে কিছু একটা শোনার জন্য। আবার আচ্ছন্ন হয়েছে। একবার তার মনে হল, কে যেন মাথায় হাত বুলোচ্ছে।

"কে?"

"রোজওয়াল।"

"উইম্বলডন পেয়েছ?"

"এখনও তো কোনসের সঙ্গে তোমার সেমি-ফাইনাল-খেলা শেষ হয়নি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। বাকী আছে বটে।"

"তুমি সেরে উঠলে হবে?"

আনন্দ মাথা কাত করল।

সকালে অরুণ গম্ভীর হয়ে গেল ওকে দেখার পর।

"ডাক্তারবাবু যা বারণ করেছিলেন, তুমি তা-ই কিন্তু করেছ। এই অসুখে সাবধানতাই কিন্তু একমাত্র চিকিৎসা, তোমায় তা বার বার বলা হয়েছিল।"

আর কিছু সে বলেনি। দুপুরে আনন্দ ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে একবার ঘুরে এল।

ইণ্ডিয়া অল আউট একশো পঁয়ত্রিশ তৃতীয় দিন লাঞ্চে। ফলো-অন। চারশো পঁচাশি রান পিছনে। খেলা এখনো আড়াই দিন বাকী। হার হার, আবার ইনিংস ডিফিট। উইকেটে লাইফ নেই, অ্যাণ্ডি একটাও উইকেট পায়নি। সোবার্স গুগলিতে দু'টো, গীবস ছ'টা, দুটো রান আউট।

হাসপাতালের কেবিনে আনন্দর কানে রেডিও। স্টেডিয়ামের হট্টগোলের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। যেন শ্মশানে খেলা হচ্ছে।

বিকেলে আনন্দর জ্বর কমে সন্ধ্যায় আবার বাড়ল, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কব্জীতে, কনুইয়ে, হাঁটুতে, পায়ের গোছে কেউ যেন হাড়গুলো চিবোচ্ছে। যন্ত্রণায় ঝনঝন করছে শরীর। কিন্তু বকুনির ভয়ে বলল না। সে যে খুব বেশী কাহিল নয়, এটা প্রমাণ করার জন্য বিপিনদা যা দিল, তা-ই খেয়ে ফেলল। বার বার উত্তরের জানলায় তাকাল অমলের জন্য। ডগুদার মামলার খবর তাকে জানতেই হবে।

পরদিন দুপুরে অমল এল।

"কী হল?"

"মা গেছল কোর্টে। শিবা দত্তর হয়ে সাক্ষী দিল। চা-ওলা

দয়ানিধি, মন্দিরে কাজ করে নেপেন নামে লোকটা, কারখানার লরি ড্রাইভার আর দুটো মজুর। সবাই বলল একই কথা। ডগুদা কারখানায় আগুন লাগাবে বলে শাসিয়েছিল, ওরা শুনেছে। আর আগুন লাগার কিছু আগে ওরা ডগুদাকে কারখানার কাছাকাছি দেখেছে।"

"ওরা সবাই শিবা দত্তর অনুগ্রহ নিয়ে চলে।"

"কিন্তু সে কথাটা তো জজকে বলে দেবার মত কেউ নেই।"

"ডগুদা বলতে পারে।"

"মা বললো, ডগুদা নাকি সারাক্ষণ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

ইতস্তত করে অমল আরো কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। আনন্দ তা লক্ষ্য করে খাট থেকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

"তোমার বাবা আমার মাকে ডেকে নিয়ে বলেছে, ডগুদা যদি জমিটা নিয়ে চেঁচামিচি আর না করে তাহলে কেস তুলে নেবে আর কারখানায় একটা চাকরিও হবে। মাকে বলেছে ডগুদাকে বুঝিয়ে বলার জন্য।"

আনন্দ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে অবশেষে হেসে উঠল।

"পাগল, ডগুদা এতে রাজি হবে ভেবেছ? এভাবে ওকে কেনা যাবে না।"

"তোমার কি শরীর ভাল নেই আনন্দ? হাঁফিয়ে কথা বলছ কেন? চোখ মুখ ফুলো-ফুলো!"

আবার হাসল আনন্দ।

"কোনর্সের সঙ্গে থার্ড সেটের খেলা চলছে ফাইভ গেম অল, ভীষণ টায়ার্ড এখন। রোজওয়াল ফাইনালে অপেক্ষা করছে আমার

জন্য। এদিকে ইণ্ডিয়া ফলো-অন খেয়েছে।”

“তুমি বেশী কথা বোলো না।”

“শুনবে আমি প্রথম ওভারে কী কাণ্ড করেছি?”

“না। তুমি শুয়ে পড়ো।”

“ফ্রেডেরিকস আমাকে পিটিয়ে ছাতু করে দিয়েছে। সারা স্টেডিয়াম শুধু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে আমাকে। আমি তখন লজ্জায় ভয়ে পালাবার ছুতো খুঁজছি। ওভারের শেষ বলে অসম্ভব একটা ক্যাচ ধরতে গিয়ে বলের ওপর বুক দিয়ে পড়েই দারুণ চোট। হাসপাতালে কেবিনে আছি এখন। বুঝলে অমল, এখন আমি সেই ভেতরের পৃথিবীতে।”

আনন্দ চোখ বুঁজল। নিঃশব্দে জানলা থেকে অমল যে সরে গেল সেটা জানতে পারল না সে। আনন্দ দেখতে পাচ্ছে সে এখন হাসপাতালে। পা টিপে-টিপে বেরোচ্ছে কেবিন থেকে। হাতে তোয়ালে মোড়া বুট-জোড়া। লম্বা বারান্দার শেষে সিঁড়ি একতলায় নেমে গেছে। জনমানব নেই কোথাও।

ইণ্ডিয়া টি-এ চার উইকেটে পঁয়তাল্লিশ। রেডিওটা বন্ধ করেই সাদা জামা আর প্যাণ্টটা দ্রুত পরে নেয় আনন্দ। নার্স এখন ঘরে নেই। যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে। বুট পরে হাঁটলে শব্দ হবে। ওটা লুকিয়ে নিতে হবে। আনন্দ ব্যানার্জি খেলছে, অথচ ইণ্ডিয়া হারবে, কী করে তা সম্ভব? বুকে চিড়িক করে উঠল একটা ব্যথা।

সে সিঁড়িতে পৌঁছে লাফিয়ে লাফিয়ে একতলায় এল। বুকের ব্যথাটা জোরে লাগছে। ব্যাণ্ডেজটা ভাগ্যিস দেখা যাচ্ছে না। বিশ্বনাথ কি ব্রিজেশের প্যাড, ব্যাট, গ্লাভস চেয়ে নিলেই হবে। আউট হয়ে গেছে ওরা।

"ট্যাক্সি, অ্যাই ট্যাক্সি। স্টেডিয়াম চলো, হয়্যার দি টেস্ট ম্যাচ ইজ নাউ বিইং প্লেড। জলদি, কুইক।"

ইণ্ডিয়া সিক্স ফর ফিফটিওয়ান। তিনদিনেই খেলা শেষ হয়ে যাবে। পতৌদি ফিরে আসছে। ক্লিন বোল্ড বাই রবার্টস। ওর উইকেট এই একটাই। দারুণ স্লো পিচ। রবার্টসের মত ফাস্ট বোলারও এব থেকে লাইফ পাচ্ছে না। অথচ ইণ্ডিয়া কোল্যাপ্‌স করে যাচ্ছে। আর রইল কে? ব্যানার্জি তো ব্যাট করবে না। প্রসন্ন, বেদী, চন্দ্র। টি-এর পর ঝপাঝপ গেল আবিদ আর পতৌদি। গাভাসকর চব্বিশ নট আউট।

আর বড়জোর আধঘণ্টা। তারপরই ম্যাচ শেষ। তখন বাসে ওঠা, কি ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত হবে। স্টেডিয়াম থেকে এখনই লোক বেরোতে শুরু করেছে।

পতৌদি মাথাটা বাঁ দিকে হেলিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে ফিরছে গ্লাভস খুলতে খুলতে। প্রসন্ন ব্যাট করতে নামবে। তাকে কী বলার জন্য মুখ তুলেই পতৌদি থমকে গেল। বাঁ চোখটা বিস্ময়ে প্রায় কপালে উঠল।

"ব্যানার্জি!"

"ব্যাড লাক, প্যাট।"

ওর পাশ দিয়ে আনন্দ এগিয়ে গেল উইকেটের দিকে।

ইনজিওর্ড, তার উপর বোলার, তাই রবার্টস প্রথম বলটা অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে মিডিয়াম-পেসে দিল। সাড়ে চারশো রান হাতে নিয়ে এমন দয়া সবাই দেখাতে পারে।

শব্দ হল টকাস।

স্কোয়্যার কাট। গালিতে গীবস ভয়ে উবু হয়ে বসে পড়ল।

বলটা দেখা গেল না বাউণ্ডারিতে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত।

সোবার্স হাসল হাততালি দিতে দিতে। কালীচরণও দিল। ওরা জানে, হারের মুখে ব্যাট করতে এসে এ-রকম ত্থ-চারটে বেপরোয়া মার সবাই মারে।

নেক্সট বলটা সোজা। টক্। বোলারের উপর দিয়ে ছয়। ওভার শেষ। গাভাসকার এগিয়ে এল কথা বলতে।

"ইউ জাস্ট স্টে দেয়্যার সানি। ওন্‌লি স্টে অ্যাণ্ড গিভ মি সাপোর্ট। ডোণ্ট টেক শর্ট রানস বিকজ—"

আনন্দ বুকে হাত দিয়ে, ইংরেজীতে কথাগুলো অনুবাদ করতে না-পেরে শুধু বলল, "পেন্।"

অবাক চোখে তাকাতে-তাকাতে গাভাসকার ক্রিজে ফিরে গেল।

পনেরো মিনিটের মধ্যে লয়েডকে ফিল্ড ছড়িয়ে দিতে হল। রবার্টসের এক ওভারে কুড়ি রান। একটা সিঙ্গল নিতে পারত, নিল না। বুকে যন্ত্রণা। গীবসের এক ওভারে ছাব্বিশ, তিনটে ছয়ই ক্রীনের উপর। সোবার্স এক ওভারে দিল ষোল। কভারে জলপোকার মত ছোটাছুটি করছে বয়েস। গোয়েন্দার মত থার্ডম্যানে লরেন্স রো পায়চারি করছে। নেমন্তন্ন-বাড়িতে খাওয়াব অপেক্ষায় বসে থাকা বরযাত্রীর মত উশখুশ করছে কানহাই, স্লিপে।

বন্যার মত রানের স্রোত চলেছে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ডুবে গেল কালীচরণের ইনিংস। সোবার্সের ইনিংস, কানহাইয়েব ইনিংস। বোম্বাইয়ে হাজার হাজার বাঙালী থাকে। নিশ্চয় তারা খেলা দেখতে এসেছে।

"লড়ে যা বাঙালী।"

আনন্দ স্ট্যাণ্ডের দিকে তাকিয়ে ব্যাট তুলল একবার।

"বেঙ্গল টাইগার, কিল দেম।"

দিনের লাস্ট ওভারের লাস্ট বলে আনন্দ ঠিক একশোয় পৌঁছল বয়েসকে লেটকাট করে। সোবার্সের মত ঠিক আশি মিনিট লাগল। লাগতো না, দারুণ ফিল্ডিং আর সানির ঠুকঠাক সময় নষ্ট করা। দুবার ফ্ল্যাশ করেছিল অফ স্টাম্পের বাইরে। আনন্দ "স্টেডি সানি, স্টেডি" বলার পর গাভাসকর আর করেনি।

ইণ্ডিয়া সিক্স ফর হাণ্ড্রেড সিক্সটি। এখনো বাকি দুটো দিন। পুলিশ কর্ডন করে রেখেছে বাউণ্ডারি তাই—নয়তো আনন্দ উচ্ছ্বাসের চাপে মারা যেত। হাজার হাজার লোক ঠেলাঠেলি করছে তাকে কিছু বলার জন্য। সব মিলিয়ে একটা বিরাট চিৎকার। লয়েড দাঁড়িয়ে গিয়ে ওকে আগে যেতে দিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টিমের সবাই হাততালি দিচ্ছে। আনন্দ চট করে গেস্ট ব্লকের দিকে তাকাল। মেজদার মুখ গম্ভীর।

বুকের ব্যথার জন্য কেউ জড়িয়ে ধরতে পারল না। সোলকার, বেদী, আবিদ গালে চুমু খেল। ডাক্তারবাবু রাগবে কিনা বুঝতে পারছে না।

"জানো, পুলিশে খবর দিয়েছে হাসপাতাল থেকে। না-বলে তুমি চলে এসেছ।"

"পুলিশে খবর দেওয়া কেন? হাসপাতালে কি কেউ রিলে শোনে না?"

"জানো, মারাত্মক কিছু-একটা হয়ে যেতে পারে তোমার। তোমার এখন নড়াচড়া পর্যন্ত বারণ।"

"ইণ্ডিয়া হারছে আর আমি শুয়ে থাকব? ব্যানার্জীকে তাহলে চেনেন না। কালও আমি ব্যাট করব।"

॥ দশ ॥

রাত্রে পাখিটা শিস দিচ্ছিল। বিছানায় উঠে টেবল থেকে টেপরেকর্ডারটা আনার মত জোর আনন্দর ছিল না। একটু পরেই মেঘ ডেকে ওঠে। বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। দোতলা থেকে অরুণ নেমে এসেছিল। জানলা বন্ধ করে, থার্মোমিটারে জ্বর দেখে।

"বাড়িতে তোর ঠিকমত দেখাশোনা হচ্ছে না। ডাক্তারবাবু বলেছেন হাসপাতালে রাখতে।"

"কেন?"

"সেখানে কড়া পাহারায় থাকবি। সেইটাই তোর দরকার।"

"হাসপাতাল থেকেও তো পালিয়ে বেরোন যায়। থার্টি টু ব্রিসবেনে এডি পেণ্টার হাসপাতাল থেকে এসে ব্যাট করে ইংল্যাণ্ডকে ছ' উইকেটে জিতিয়েছিল। তিরাশি রান করেছিল পেণ্টার। গল্পটা তো তুমিই বলেছিল।"

অরুণ চলে যাবার পর আনন্দ হেসেছিল। সারাদিনটা সে বিছানায় শুয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কাটিয়েছে। একবার তার মনে হয়েছিল, এইভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। এই পৃথিবীতে এমন কি সুন্দর ভাল জিনিস আছে যেজন্য বেঁচে থাকা যায়? আবার তার মনে হয় সারা পৃথিবী সুন্দর আর ভাল জিনিসে ভরে আছে, এই বাড়ির বাইরে বেরোলেই সেই জিনিস-গুলোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতে সে মনমরা হয়ে

শুয়ে থাকে। বিকেলে ইচ্ছে হয়েছিল দোতলায় যেতে। এতদিনে একবারও ওঠেনি। জানলায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখল দুটো ঘুড়ির লড়ালড়ি। ঘুগনিওলার ডাক শুনে লোভ হয়েছিল, কিন্তু কাছে একটা পয়সা নেই।

সন্ধ্যায় আনন্দ বাড়ি থেকে বেরোতে গিয়ে ধরা পড়ল বিপিন-দার হাতে।

"না, একদম বারণ।"

কোন ওজর, কাকুতি-মিনতি বিপিনদার কানে গেল না।

"ফটকে সারাক্ষণ তালা দিয়ে রাখতে বলে গেছে মেজবাবু, তা জান? বাবুর লোকজন সেরেস্তায় আসবে বলে এখন তালা খুলে ফটক পাহারা দিচ্ছি।"

আধ ঘণ্টা পর আনন্দ নিঃসাড়ে বাগানের পুব পাঁচিলের ভাঙা নিচু দিকটা টপকাল। মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে বীরা দত্ত রোডে। সেখান থেকে জোরে হেঁটে দেবুদার বাড়িতে। তখন ওর সারা শরীর থরথর কাঁপছে। চিৎ হয়ে শুয়ে দেবুদা একটা পেপারব্যাক পড়ছিল। বইটা মুখ থেকে ধীরেধীরে নামিয়ে কয়েক সেকেণ্ড স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"কী হয়েছে তোর?"

"কিছু না। হাঁফিয়ে গেছি।"

দেবুদা আবার বইটা মুখের উপর তুলে ধরল।

"তোর ডগুদা ছাড়া পেয়ে গেছে।"

"কি করে?"

"শিবা দত্ত মামলা তুলে নিয়েছে।"

"সে কী! ডগুদা রাজি হল?"

আনন্দর চোখের সামনে দেবুদা ঘোলাটে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিরাট একটা হাতুড়ি দিয়ে কেউ যেন তার মাথায় এইমাত্র মারল।

"কেন রাজি হবে না ?" দেবুদা বলল।

"শুনেছি ওরা বলেছিল জমির মালিকানার ব্যাপারটা যদি চেপে যায়, যদি ডগুদা আর চ্যাঁচামিচি করে ব্যাগড়া না দেয় তাহলে মামলা তুলে নেবে, একটা চাকরিও দেবে। ঠিকই করেছে ডগুদা।"

আনন্দর মাথার মধ্যে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তার দেখা শোনা বোঝা ধারণাগুলো। যা সত্যি, খাঁটি তার জন্য মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করবে কষ্ট স্বীকার করবে, এটাই সে এতদিন জেনে এসেছে।

"আপনিও এই কথা বলছেন ?"

"কেন বলব না ? পাড়ার ছেলেরা খেলবে বলে জমি নিয়ে ঝগড়া করা, জেল খাটা, শেষ পর্যন্ত এতে কি লাভ ? কই, পাড়ার কোন লোক তো ওর পাশে এসে দাঁড়াল না ? আনন্দ, একটা কথা সবার আগে—নিজে বাঁচো তারপর অন্যকে বাঁচাও। ডগুদা তাই করল, বুদ্ধিমান লোক। চিরকাল লোকের উপকার করে বেড়িয়ে এখন বুঝতে পেরেছে এতে কোন লাভ নেই। আগে নিজের উপকার তারপর অন্যের।"

কথা না বলে আনন্দ শুধু দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। দেবুদা বইটা আবার মুখের উপর তুলে ধরতেই সে নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে এল। ডগুদার বাড়িতে গিয়ে এখন একবার শুধু জিজ্ঞাসা করবে, কেন সে হার মেনে নিল।

বাড়ির সদর দরজার পাশে খুপরি একটা ঘরে ডগুদা থাকে। রাস্তার উপরেই ঘরের দরজা। বাড়ির ভিতরের সঙ্গে সম্পর্ক একদা

ছিল একটা দরজা মারফৎ। এখন দরজাটা নেই তার জায়গায় দেয়াল উঠেছে। আনন্দ দূর থেকেই দেখল ডগুদার ঘরে হারিকেনের আলো জ্বলছে, দরজাটা আধ ভেজানো।

ডগুদা তক্তপোশে পা ছড়িয়ে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে। থুতনিটা মুঠোয় ধরা। গভীরভাবে একটা কিছু চিন্তা করছে। তার পায়ের দিকে বসে আছে গীতা মাথা নীচু করে। সেও কিছু একটা চিন্তা করছে। আনন্দ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই থতমত হল। লেডি সোবার্সকে এখানে দেখতে পাবে সে ভাবেনি। ওরা দুজনে চমকে উঠে তার দিকে তাকাল।

"কি চাই?" ডগুদা একটু রুক্ষস্বরেই বলল।

"শুনলাম, আপনি নাকি চাকরি নিচ্ছেন শিবা দত্তর, এটা কি সত্যি?"

ওরা দুজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ডগুদা সিধে হয়ে বসে বলল, "হ্যাঁ। তাতে তোর কি?"

"তাহলে মাঠটার কি হবে?"

ডগুদা চুপ করে রইল।

"লাইব্রেরীটাও উঠে যাবে?"

দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল ডগুদা।

"মাঠে মেয়েদের ট্রেনিং বন্ধ হয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ সব যাবে, সব বন্ধ হয়ে যাবে, তাতে আমার কি? আমি আর কোন ঝামেলায় জড়াব না। এখান থেকে আমি চলে যাব। আমার বয়েস হচ্ছে, আর ক'টা দিনই বা বাঁচব।"

ডগুদার গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে হঠাৎ থেমে গেল। আনন্দর মনে হল এই ঘরটা যেন মাটির নীচে, তার চারদিক চাপা। এখানে তার দম

.বন্ধ হয়ে আসছে। যেমনভাবে দেবুদার কাছ থেকে উঠে এসেছিল, সেইভাবেই সে ঘর থেকে বেবিয়ে রাস্তায় এল। আধ অন্ধকার রাস্তা দিয়ে সে মাঠের কাছাকাছি আসতেই পিছন থেকে অমল ডাকল।

"কি বলল ওরা ?"

"ওবা ?"

"ডগুদা আব মা ?"

"জান অমল এখন আমার ইচ্ছে করছে প্রচুব আলো প্রচুর হাওয়াব মধ্যে ঘুবে বেডাতে। চাবিদিক এত দমবন্ধ করা লাগছে। ডগুদাকে খুব স্পিবিটেড, সৎ বলে জানতাম কিন্তু শিবা দত্তর কাছে যে নিজেকে এত সহজে বিক্রি কবে দেবে আমি ভাবিনি।"

"ওবা বিয়ে করবে তাহলে ?

"কি কববে ? আনন্দ প্রায় চীৎকাব কবে উঠল।"

"ডগুদা আব তোমার লেডি সোবার্স। অন্য জায়গায় বাসা নিয়ে থাকবে, সেই কথাই ওবা আলোচনা কবছিল।"

"তোমার মা···লেডী সোবার্স! কেন, কেন ?" থরথর কাঁপতে লাগল আনন্দ।

"সকলের মত ওবাও বাঁচতে চায় যে।"

"আমিও তো চাই। অমল অমল আমাব কি হবে—" আর্তনাদে চিরে গেল আনন্দব গলা।

"তুমিও বাঁচবে, চিবকাল খেলা করে বাঁচবে।"

হঠাৎ যেন বিবাট ঘুঁষির মত কথাটা আনন্দর বুকে লাগল। যন্ত্রণায় সে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ার আগে হেসে উঠল সারামুখ উজ্জ্বল করে। ও তো জানত না, জমাটবেঁধে-যাওয়া রক্তের একটা দানা সেই মুহূর্তে তার ব্রেনের দিকেই ছিটকে যাচ্ছে।

ও তখন জানত না, সারা জীবনের জন্য ওর শরীরের বাঁ দিকটা অসাড় হয়ে যাবে। ও জানত না, ডাক্তারবাবু এই ভয়টাই অরুণকে বলেছিলেন।

দোতলার ঘরে নিজের খাটে শুয়ে আছে আনন্দ। বিপিনদা এইমাত্র তাকে পাশ ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। জানলা দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে আকাশটা গাঢ় নীল, সাদা টুকরো মেঘ ইতস্তত: ছড়িয়ে অপেক্ষা করছে হাওয়ার। পেলেই ওরা ভেসে বেড়াতে শুরু করবে। আনন্দ অপেক্ষা করছে ওদের ভেসে বেড়ানো দেখার জন্য। বিছানায় শুয়ে জানলা দিয়ে সে আকাশ, মন্দিরের ধ্বজা আর একটা নারকেল গাছের হঠাৎ বাতাসে দোলা মাথা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। আর শুনতে পায় শব্দ—কর্কশ রুক্ষ ধপাধপ দুমদাম মাল ফেলা আর তোলার শব্দ মাঠটা থেকে। মাঠে ছেলেমেয়েরা আর খেলে না। ডগুদা, লেডী সোবার্স আর অমল কোথায় যেন চলে গেছে এই অঞ্চল ছেড়ে।

দিন চারেক আগে সেই পাখির ডাকটা সে অনেকদিন পর শুনতে পেয়েছিল। গভীর রাতে শিসটা লণ্ঠনের মত দুলতে দুলতে জানলার বাইরে দিয়ে চলে যায়। ভাগ্যিস টেপরেকর্ডারে ধরে রাখেনি? রাখলে, এমন করে অবাক হওয়ার মজাটা ফুরিয়ে যেত।

তন্দ্রা আসছে আনন্দর। চোখের পাতা জুড়ে আসছে ঘুমে। এমন সময় একটা স্বর ফিসফিস করল:

"ব্যানার্জি আমি তোমার সঙ্গে ফাইনালে খেলার জন্য অপেক্ষা করছি।"

"কিন্তু আমি যে কোনর্সের সঙ্গে খেলাটা শেষ করতে পারছি না!

ওকে হারাবার পরই তোমার কাছে আমায় তো হার মানতেই হবে, তখন যে আমার খেলাও ফুরিয়ে যাবে। আমি যে অনেকদিন খেলতে চাই।"

"ব্যানার্জি তুমি আমাকেও হারিয়ো।"

"না না, তোমাকে আমি হারাতে পারব না।"

"তুমি হেরে গেলে তোমার দেশের লোক দুঃখ পাবে।"

"পাক্ পাক্। আমার ইচ্ছেয় আমি হারবো আমার ইচ্ছেয় আমি জিতবো। আমি একটা দারুণ পৃথিবীতে চলে যাব যেখানে আমায় কেউ হারাতে পারবে না। কিন্তু মুশকিল কি জানো, জিতে ফেললেই সেই পৃথিবীটা থেকে আমায় বেরিয়ে আসতে হবে তাই কোনর্সের কাছে আমি জিতছি না। তুমি কী অধৈর্য হয়ে পড়ছ?"

"আমি ভয় পাচ্ছি ব্যানার্জি। কোনর্সের সঙ্গে খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন তুমি যে ম্যাচ ছেড়ে দেবে।"

"না, মোটেই না। উইম্বলডন থেকে চলে যাব ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ইণ্ডিয়াকে ইনিংস ডিফিট থেকে বাঁচাবার জন্য আমি ব্যাট করব। এখন আমি একশো নট আউট, দুটো দিন ব্যাট করতে হবে। রেকগনাইজড ব্যাটসম্যান বলতে আছে শুধু গাভাসকর। আমি একটার পর একটা রেকর্ড ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যাব। পঞ্চাশ রানে ইণ্ডিয়াকে এগিয়ে দিয়ে আউট হবো। শেষদিন টি-এর পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাট করতে নামবে আধঘণ্টায় ওই রানটা তুলে নিয়ে ম্যাচ জিততে। কিন্তু ফাস্ট বোলার ব্যানার্জি যে কি জিনিস এইবার ওরা তা দেখতে পাবে, কখনো দেখেনি এমন বোলিং করব।"

"সেই ম্যাচও তো শেষ হবে একদিন।"

"হোক। সারা পৃথিবী জুড়ে খেলা চলেছে রোজওয়াল, তুমি কি

কাগজ পড় না? দেখ না রোজ কত জায়গায় কত খেলা? অফুরন্ত অগুন্তি। আমি এই বিছানায় শুয়ে একটার পর একটা খেলা খেলে যাব। শেষ সুযোগ সব সময় আমার সামনে থাকবে—চিরকাল। সারা পৃথিবী গ্যালারিতে বসে অপেক্ষা করে থাকবে আমাদের ফাইনাল খেলাটার জন্য।"

দোতলার ঘরে, দুপুরে, জানলা দিয়ে তাকিয়ে মেঘেদের ভেসে বেড়ানো দেখার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আনন্দর মুখের ওপর হালকা মেঘের মত একটা হাসি ভেসে বেড়াতে লাগল। চোখদুটো জলে ভরে আসছে। তার উপরই ঝলমল করে উঠল নরম আভা নিয়ে বুকের মধ্য থেকে ফুটে ওঠা মিষ্টি রোদ। মনে মনে সে তখন বলল: এত খেলা, চারদিকে এত খেলা!

—